অগ্নিপুরুষ

শ্রীসাধনা বিশ্বাস

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা—১২

অগ্নিপুরুষ

চাচাজি!

হাঁ, বোল রহা হুঁ।

হ্যালো, চাচাজি—

হাঁ, বোলা তো বোল রহা হুঁ।

ইয়ে টেলিফুন রিসিভার সে ঠিক সে শুনাই নহি দে রহা হ্যায়। আপকো টেলিফুন মে কোই গড়বড়ি হ্যায় কা?

নহি তো। ইয়ে যো কর্ডলেস পে বাত কর রহা হুঁ ইয়ে করিব ছে মাহিনা হুয়া। বলতে বলতে জামসেদজি ওয়াদিয়া নিজের মতো গলা খাকারি দিলেন। একবার, দুবার জোরে। তিন বারেরটা একটু আস্তে, পর পর। বাহাত্তর পেরিয়ে যাওয়ার পর এমন ভোর ভোর কথা বলতে গেলে গলার ভেতর শ্লেষ্মার একটা হালকা আঠালো পরদা ঝুলে থাকে। বার দুই-তিন খাকরে নিলে তারপর খানিকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর আবার কিছুক্ষণ কথা বলার পর নতুন করে সেই পরদা চেপে বসতে চায়। শীতে আরও বেশি হয়। আর এখন, এই প্রথম ভাদ্রে শেষ রাতে ঝমঝমিয়ে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর ওয়াদিয়া ম্যানসনের সামনে ফাঁকা ঘাসজমি, বড় বড় গাছের ছায়াল সবুজ থেকে একটা অন্যরকম গন্ধ উঠে আসে। কত রকমের পোকামাকড় বেরিয়ে আসে ঘাসের আড়াল থেকে। তাদের ধরে খাওয়ার জন্য ঘন সবুজের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে নামে পাখিরা। বুলবুল, দোয়েল, শালিক, গাঙশালিক।

কর্ডলেস হ্যান্ডসেট কানে লাগিয়ে আবারও গলা ঝাঁকালেন জামসেদজি ওয়াদিয়া।

আপকে তবিয়ত ঠিক তো হ্যায় না চাচাজি!

হাঁ, চল রহা হ্যায়।

ম্যায় ফিরোজ, ফিরোজ ওয়াদিয়া। আপকা ভাতিজা। গুজরাত সে—

হাঁ, ওতো ম্যায় সমঝ গায়া হুঁ। বোলো ফিরোজ, কেয়া কহনা চাহতে হো?

এরকম গলা খাকারির শব্দে বেশ বিরক্তই হত এরুচশা। এরুচশা ওয়াদিয়া। ছ'মাস আগে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাত্র একটাই গুলি। মোটরসাইকেলে এসেছিল ওকে মারার লোকেরা। আমার থেকে প্রায় পনের বছরের ছোট এরুচশা।

ভাদ্রে একটা গুমোট সব সময়ই থাকে। তবু এই বাড়ির সামনে অনেকটা ফাঁকা

জমি। তাতে বড় বড় গাছ। সেই গাছের আড়ালে আড়ালে কয়েক রকম পাখি। তাদেরই কোনো একটা লম্বা গাছের মাথায় পাতার আড়াল থেকে, নয়ত কোনো ঝাড়ালো বেঁটে গাছের সবুজের ভেতরে ডেকে উঠল। টু-হি-টু-হি—টু-হি।

কী পাখি এটা! নিজের ভেতর হাতড়াতে শুরু করলেন জামসেদজি ওয়াদিয়া। বড় ছেলে জাহাঙ্গীর থাকলে হয়ত বলে দিত। সে নেই আজ তিরিশ বছর। কলকাতার রাস্তায় কার অ্যাকসিডেন্টে—

কী পাখি হবে! কিছুতেই মনে পড়ছে না। এত হাতড়াচ্ছি মনের ভেতর। আঁতিপাতি খুঁজছি, তবু পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে জামসেদজি আবার শুনতে পেলেন—চাচাজি ম্যায় ফিরোজ।

হাঁ, বোলো বেটা। কেয়া বাত হ্যায়!

আপকা তবিয়ত তো ঠিক হ্যায় না?

বোলা না বেটা, ম্যায় ঠিক হুঁ। তুমলোগ ক্যায়সে হো। সব সাহি সলামত হ্যায় না ইতনা সুবে সুবে ফোন কর রহে হো।

হামলোগ তো সব খয়রিয়ত। লেকিন আপকা জুবান মে কুছ ঘাবড়াহট আ রহ হ্যায়। আপ কুছ ছুপা রহা হ্যায় মুঝসে!

যার বউ পরিষ্কার দিনের বেলায় অচেনা বন্দুকবাজের গুলি লেগে মারা যায়, ছ'মাস হয়ে যাওয়ার পরও সেই খুনেদের একজনও ধরা পড়ে না, খুনের কিনারা হওয়া তো অনেক দূরের কথা, তা ছাড়া এই কম-বেশি সাত কাঠা জমির ওপর ঠাকুরদার তৈরি ওয়াদিয়া ম্যানসন—তার দিকেও লোভের থাবা এগিয়ে এসেছে প্রোমোটারের। ভয় দেখিয়ে উড়ো ফোন আসে মাঝে মাঝেই, এরুচশা বেঁচে থাকতে ওসব হুমকিকে পাত্তা দিইনি। ভাবিইনি কখনও ফোনের থ্রেটনিং সত্যি হবে। দিনেদুপুরে মোটরসাইকেলে আসা বন্দুকবাজদের একটা গুলিতে শেষ হয়ে যাবে এরুচশা!

ফোনে এখনও হুমকি ভেসে আসে মাঝে মাঝেই। তাই হঠাৎ হঠাৎ ফোন বেজে উঠলে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপানি বেড়ে যায়। কথা বলতে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যায় গলা। ব্যাপারটা লোকাল থানাকে জানানোর পর ওরা কি সব মেশিন-টেশিনও নাকি বসিয়ে দিয়েছে। নিজেও একটা ভয়েস রেকর্ডার লাগিয়েছি ফোনের সঙ্গে। তবু ভয় তো থেকেই যায়।

দু-দুটো ছেলের এক জনও রইল না। বড় জন তো কার অ্যাকসিডেন্টে চলে গেল আর ছোট জন গুজরাটের ভূমিকম্পে। ওখানে ব্যবসা করত। তার বউও একই সঙ্গে অলবিদা জানিয়ে চলে গেল। একই সঙ্গে। পুরো ফ্ল্যাটবাড়ি তাসের ঘর হয়ে মাথায় ভেঙে পড়লে কে আর বেঁচে থাকে! কিন্তু নাতি দুজনই স্কুলে ছিল। তাদের মধ্যে ছোটটা বেঁচে গেল। বড়টা পারল না। তার সেভাবে কোনো ট্রেসই পাওয়া যায়নি।

চাচাজি, আপনে শুনা হোগা, পড়া ভি হোগা আখবার মে—

ফিরোজ, জানতে চাইছে আমি সেই গাছের কথা খবরের কাগজে পড়েছি কি না। না ফিরোজ, আমাদের এখানে ক্যালকাটা এডিসনের যে সব ন্যাশনাল ডেইলি, তাতে

খবরটা দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। ফিরোজ বলল, আমাদের ওখানে খবরটা বড় করে বেরিয়েছে। সঙ্গে ছবিও ছিল ঐ গাছের। সবুজ গাছ। গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট লাল আম। ফিরোজ জানানোর আগেই জানি দক্ষিণ গুজরাটে ভারলি নদীর তীরে ছোট্ট শহর সনজান। সেখানে এই আশ্চর্য গাছ। ঠিক সনজান শহরে নয়, শহর থেকে এক কিলোমিটারও হবে না, সেখানে ভিলবাদি গ্রাম। সেই গ্রামেই আমগাছ। যার সঙ্গে পার্শিদের ভারতে আসার স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ফিরোজ বলছে, শুনছেন জামসেদ ওয়াদিয়া। গাছ নিজের খুকে বেয়ে এগোতে এগোতে কোনো জমির সীমানা মানে না। এখন সেটাই বড় অসুবিধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই অক্ষয়-বৃক্ষের ডাল পড়ছে কাটা।

জামসেদজি দেখতে পাচ্ছেন সবুজ গুঁড়িঅলা ডালটি ধনুক হয়ে বেঁকে যায়। তারপর গাছের সেই শাখা মাটি ছুঁলে নতুন শেকড় গজায়। এরপর শুকিয়ে মরে যায় পুরনো ডাল। নতুন গাছ বাড়ে। বড় হয়। তারপর ঐ গাছের ডাল আবার বেঁকে গিয়ে মাটি ছোঁয়। তারপর আবার নতুন সৃষ্টি।

শেষ রাতে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর চারপাশের গরম একটু যেন কমেছে। ওয়াদিয়া ম্যানসনের দোতলা থেকে নেমে একতলায় রাখা মেহগনির সাবেক ইজিচেয়ারে বসলেন জামসেদ। খালি চোখে বাড়ির বাগানের বড় হাতা চোখে পড়ছে। বড় বড় গাছ। আম, কাঁঠাল, পাম, দেবদারু—সব ঠাকুরদা জাহাঙ্গির ওয়াদিয়ার করা। তিনি ছিলেন নামকরা ব্যারিস্টার। তখনকার দিনে গোটা তিনেক মোটরগাড়ি রাখতেন। তার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড ছিল একটা, মনে আছে। আর একটা ঘোড়ার গাড়ি।

ফিরোজ যে গাছের কথা বলছিল, তেমন গাছ এদেশে আরও আছে। তাদের কারও নাম অক্ষয় বট। কারও নাম কবীর বট। গুজরাটের ভারুচ জেলার নর্মদা তীরে আছে কবীর বট। শোনা যায়, সন্ত কবীর দাস এই গাছ লাগিয়েছিলেন। তাই এই গাছের নাম কবীর বট।

ইয়ে পেঁড় খতরে মে। ধানজমির মালিক সেই বাড়বাড়ন্ত মানবে কেন! তাই গাছ পড়ছে বিপদে। তার ডাল যাচ্ছে কাটা।

এ গাছের কথা—মানে ফিরোজের বলা আম গাছের কথা আছে রুস্তম বাজোরি পে মাস্টার-এর লেখা বইয়ে। রুস্তম বাজোরি পে মাস্টার ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। ১৯১৬ সালে বইটি ছাপা হয়েছে। আমার লাইব্রেরিতে আছে এ বই। ১৯১৬-তে ছাপা এই বইয়ে আছে, তখন এই আম গাছের গুঁড়ির বেড় ছিল পঁয়ত্রিশ ফুট। তার শাখা ছিল দশটি।

ইজিচেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সিঁড়ি বাইতে শুরু করলেন জামসেদ। ভোরের চা পড়ে রইল টেবিলে। দোতলায় বার্মাটিকের শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রুস্তমজির লেখা বইটি খুঁজে টেনে বের করে আনলেন বাইরে। তারপর সামান্য লালচে হয়ে যাওয়া পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে খুঁজে পেলেন সেই গাছটির কথা। এই তো—এই

তো লেখা আছে এখানে। ডান হাতের আঙুল ছুঁইয়ে জায়গাটা দেখলেন। ঠিকই মনে আছে আমার—জামসেদের মনে হলো। এই তো, এখানে লেখা আছে। গাছের গুঁড়ির বেড় পঁয়ত্রিশ ফুট। শাখা দশটি। না, স্মৃতি ঠিকই আছে—এই তিয়াত্তরে। মনে থাকে ঠিকঠাক। আবার ভুলেও যাই কিছু কিছু।

বার্মাটিকের সাবেক শো-কেসে বইটি গুছিয়ে জায়গা মতো রেখে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন জামসেদ। বড় বড় গাছেরা উঠোনে তেমনই স্থির। এর আড়াল থেকে হঠাৎ যদি কোনো শার্প শ্যুটার বেরিয়ে এসে তার নাইন এম এম পিস্তলের গুলিতে আমায় শুইয়ে দিয়ে যায়! কিছু করার থাকবে না। আমার কাছে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট কোল্ট আছে। সেটাও ঠাকুরদার। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। কিন্তু কোল্ট তো বেশ পুরনো মডেলের রিভলভার। এখন কত নতুন নতুন মডেল। গুলির বোর। রোজ একবার করে রিভলভারের গুলি বের করে চেম্বারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি। চালু রাখি। ট্রিগার দাবাই। যাতে না চট করে নিশানা মিস হয়। তেল দি। বুলেটগুলো গুছিয়ে রাখি চামড়ার ছোট কৌটোয়। সিসের মুখ, পেতলের খোল। খোলের পেছনে পয়েন্ট করা ফায়ারিং পিন ছোঁয়ানোর জয়াগা। রোজ নাড়াচাড়া করতে করতে পয়েন্ট থ্রি এইট গুলিগুলো বেশ চকচকে। চেম্বারে ভরে চেম্বার লক করে বালিশের নিচে রাখি, আমার স্ত্রী এরুচশা নাম-না-জানা বন্দুকবাজের গুলিতে মারা যাওয়ার পর। এত বড় একটা বাড়ি, এতগুলো ঘর, এতরকম সব কিউরিও, নিজের পুরনো মডেলের ফিয়াট কোম্পানির প্রিমিয়ার, সব মিলিয়ে আমি। রোটারি ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব, টালিগঞ্জে গিয়ে গল্‌ফ খেলা—এসব তো নিয়মিত রুটিন। খালি এরুচশা খুন হওয়ার পর, টেলিফোনে ক্রমাগত হুমকি আসতে থাকাটাকে খানিকটা সত্যি ভেবে নিয়ে মুভমেন্ট একটু রেসট্রিকটেড করছি।

ছোট ফ্লাস্কে করে চা রেখে গেছে সরস্বতী। নিজের নাম বলে সরস্‌তি। বিহারের হাজারিবাগে বাড়ি। সেই 'দেশে' বড় জোর বার দুই যাওয়া-আসা আছে বছরে। ও জানে আমি এখানে বসে বসে তিন কাপ কালো চা খাব। খবরের কাগজ এলে, তিনখানা ইংরেজি ন্যাশনাল ডেইলি খুঁটিয়ে পড়ব। একেবারে আদ্যপান্ত যাকে বলে। চা খেতে খেতে যদি টয়লেট যেতে হয়, তাহলে কাগজগুলো বগলদাবা করেই টয়লেটে ঢুকে যাব। কমোডে বসে বসে কাগজ পড়ার একটা অন্যরকম মজা আছে। মন দিয়ে সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়। আজকাল তো খবরের কাগজ খুললেই মনে হয় রক্তের ছিটে এসে গায়ে লাগে। এত ভায়োলেন্স। খুন, জখম। রাহাজানি, ডাকাতি। থ্রিলারের সিরিয়াল চলছে।

কোথায় কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে। তারপর তাকে আটকে রেখে হেভি অ্যামাউন্টের র‍্যানসম—আই মিন, বাংলায় কি যেন বলে, মুক্তিপণ চাইল। তারপর কিডন্যাপারদের সঙ্গে যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, তাদের বাড়ির লোকজনের দরাদরি চলল। কোটি কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। এখান থেকে টাকা মুম্বাই হয়ে

হয়ত দুবাই চলে যাবে। সেখানে বসে আছে কিডন্যাপ গ্যাংয়ের কিং পিন। সেই সব প্ল্যান সাজাচ্ছে। তাকে কেউ ধরতে পারছে না। এত সি আই ডি, সি বি আই, র—কেউ তার নাগাল পাচ্ছে না। কি আশ্চর্য!

ফ্লাস্ক থেকে পোর্সিলিনের দামি কাপে চা ঢেলে খুব আস্তে আস্তে চুমুক দিলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। প্রত্যেকটা খবরের কাগজে সেই ধারাবাহিক থ্রিলার। ভাবতে ভাবতে জামসেদ আবারও সামনের দিকে তাকালেন। আজ কাগজ দিয়ে গেলে হয়তো নতুন কোনো রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা থাকবে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভোরে ভাইপো ফিরোজের সঙ্গে টেলিফোনে যেসব কথা হয়েছে, তার একটা টুকরো মনে পড়ে গেল জামসেদের।

ফিরোজ বলছিল, এখন যে গাছটা তার ডালকে শিকড় বানিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, তার গুঁড়ির বেড় পঁচিশ ফুট। এই আমগাছ বুক বাইতে বাইতে ভিলবাদি গ্রামের এক মুসলমান কৃষকের খেতির ভেতর ঢুকে পড়ে। আহমেদ নামের সেই কৃষকের জমি থেকে গাছ এখন এগোতে শুরু করেছে ভাল্লির জমির দিকে। ধানচাষ হয় ভাল্লির জমিতে। বড় ধানজমি। সেখানে এই গাছ ঢুকতে চাইছে। পঁয়ত্রিশ ফুটের গুঁড়ি এখন পঁচিশ ফুট। তবু গাছ এগোচ্ছে।

জামসেদ তাঁর চোখের সামনে সেই চলন্ত গাছ দেখতে পেলেন। যার ডাল ধনুক হয়ে বেঁকে মাটি ছোঁয়। তারপর সেখানেই গজায় শেকড়। এরপর শুকিয়ে মরে যায় পুরনো ডাল। সেখানে আবার নতুন শাখা। গাছ বাড়ে। সবুজ সবুজ পাতায় ছেয়ে যায় তার সমস্ত শরীর। সেখানে ফল ধরে। পাখিরা বসে। এভাবেই তো জীবন এগোয়।

ফিরোজ টেলিফোনে গাছের বিপদের কথা বলতে বলতে বারবার ঢোক চিপছিল।

এদিকে আমারও খুব বিপদ ফিরোজ। প্রোমোটাররা— একজন নয়, ঠিকঠাক বলতে গেলে তিনজন, ওয়াদিয়া ম্যানসন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাদের টাকার থলি, পলিটিক্যাল কনট্যাকট, মাসলম্যান, বন্দুক—সব আছে। পুলিশের অনেকে এসব বদমাইশি দেখেও দেখে না। এই প্রোমোটাররা আবার কেউ কেউ 'সমাজসেবী' বলে নাম কিনেছে। ক্লাবে ক্লাবে কালার টিভি কিনে দেয়া, ক্লাব-বিল্ডিং বানানো, সবরকম শেডের পলিটিক্যাল পার্টিকে মোটা ডোনেশান দেয়া—সবই এদের নিয়মিত রুটিন।

দূরে, কোন সবুজের আড়ালে নিজেকে ঢেকে ডেকে উঠল পাখিটা। টু-হি—টু-হি—টু-হি। কি আশ্চর্য, কিছুতেই দেখা যাচ্ছে না তাকে। কেমন হবে তার রঙ! খুব উজ্জ্বল হলুদ! গলায় কালো দাগ একটা। কিংবা গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী নীল। সেই রঙ চুম্বক হয়ে টেনে রাখে চোখকে। কিন্তু ক্লান্ত করে না।

তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে বিদেশি বাইনোকুলারটা আনলে হয়তো ঠিক দেখা যেত পাখিটা এখন কোথায়! কোন সবুজ গহনে? আড়াল থেকে তার ডাক—টু-হি—টু-হি। টু-হি—।

এরুচশা খুব পাখি চিনত। নানারকম পাখি। তাদের ফুড হ্যাবিটস। পাখার রঙ। পালকের গঠন। মেটিং সিজন। বাসা বানাবার পদ্ধতি।

বাইনোকুলার হাতে ভোর ভোর কিংবা বিকেলে ওয়াদিয়া ম্যানসন-এর সামনের বাগানে হেঁটে বেড়ান এরুচশা। ছবিটা স্থিরচিত্র হয়ে বিঁধে আছে জামসেদ ওয়াদিয়ার মাথার ভেতর। ডাই করা স্টেপ কাট চুল। নাকে একটা বেশ বড় ডায়মন্ডের নাকছাবি। তার আলোয় আলো হয়ে আছে এরুচশা ওয়াদিয়ার মুখ। সকাল-বিকেল নিয়মিত রূপচর্চা, শরীরচর্চার অভ্যেস ছিল। পানপাতা ডিজাইনের মুখ। সেই মুখে প্রসাধনের পলকা প্রলেপ। বেশ লম্বা। হ্যাঁ, তা তো হবেই পাঁচ সাত, কারণ আমিই পাঁচ এগারো প্রায়। তার সঙ্গে ম্যাচ করে পরা শাড়ি-ব্লাউজ। নয়তো সালোয়ার-কামিজ। কি সুন্দর, গ্রেসফুল যে লাগত এরুচশাকে।

আসলে শুনতে খুব খারাপ লাগবে। বউ যদি মারা যায়ই, মানে তাকে যদি মরতেই হয়, তাহলে প্রথম যৌবনেই মারা যাওয়া উচিত। নিঃসঙ্গতা সেভাবে গিলে ফেলতে পারে না। নতুন নতুন তরঙ্গ এসে ভরিয়ে দেয় পুরনো সব ফাঁক-ফোকর। আবার অনেকটাই ঠিক হয়ে যায় সব। কিন্তু মধ্যবয়সের পর বউ মারা গেলে তখন সব অন্ধকার। কিছুই থাকে না আর। এমনকি কথা বলারও লোক নেই। নিঃসঙ্গতা। হা-হা নিঃসঙ্গতা শুধু। এতবড় আলিশান বাড়ি, ফার্নিচার, বাগান, গাছপালা, বড় বড় স্যান্ডেলিয়ার, ঝাড়বাতি, রাজ্যের আর্ট অ্যান্ড অ্যান্টিক অবজেক্ট, বেলজিয়াম কাচের, ভেনিসের—বড় বড় ইতালিয়ান আয়না—সব কেমন হাঁ করে গিলতে আসে। অথচ এরুচশা থাকতে এমন হতো না। ভাবতে ভাবতে মেহগনির সাবেক ইজিচেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন জামসেদ। কেমন একটা অবসন্ন ভাব। ক্লান্তি। ধীরে ধীরে ঘিরে ধরছে। জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়া—এই বয়সে! আর যেন পারা যায় না।

হঠাৎ-ই আবারও সেই পাখিটা ডেকে উঠল—টু-হি, টু-হি, টু-হি।

কোথাও লুকিয়ে আছে হয়তো। দেখা যাচ্ছে না। ওপর থেকে গিয়ে বাইনোকুলার নিয়ে আসার ইচ্ছেটাও চলে গেল মন থেকে। পাখিটা থেকে থেকেই ডেকে চলে। দূরে। আবার মনে হয়, এই তো কাছেই। কাছেই আছে। একেবারে নাগালের ভেতর। একটু উঁকি দিলেই দেখা যাবে।

বাগানে—সবুজের ভেতর বসার সময় কর্ডলেস ফোনটা থাকে হাতের কাছে। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে দূরে, কাছে সবুজের দিকে তাকালে চোখ আরাম পায়। একটা হলুদ প্রজাপতি, তার পেছন পেছন একটা কালো—দিব্যি ডানা নাড়িয়ে উড়তে উড়তে দূরে কোন সবুজের আড়ালে বুঝি মিশে যেতে চায়। একটা ঘাসফড়িং, তার সঙ্গে আর একটা দোল খায় ঘাসের ডগায়। দোল খেতে খেতে হঠাৎ লুকিয়ে পড়ে। চুপিসাড়ে নেমে এসেছে দোয়েল। কালচে-ছাই রঙ, শাদা পেট বুক—সব মিলিয়ে তেমন আহামরি চেহারা কিছু নয়। কিন্তু বড্ড সুন্দর গান গায়। সেই শিসে মন ভরে যায়। কিন্তু এখন দোয়েলের গলায় কোনো গান নেই। সব চুপচাপ। ঘাসফড়িং খোঁজার জন্য জোড়া পায়ে লাফ দিল দোয়েল।

তখনই ফোনটা বেজে উঠল। কুরুর কুরুর কুরুর কুরুর।

হাতের দম-দেয়া 'কেমি'-তে সময় দেখলেন জামসেদ। সোয়া ছটা। ভাদ্র মাসের রোদে একটু পরেই তাপ বেড়ে যাবে। সেই তাত সহ্য করে বসা যাবে না। ঘাম হবে। কুলকুল করে ঘাম। হিউমিডিটির সঙ্গে ঘাম। এত ক্লান্ত লাগে শরীর। কিছু করতে ইচ্ছে করে না। নড়তে-চড়তেও না।

কুরুর কুরুর। কুরুর কুরুর। কুরুর—

ফোনটা বেজেই যাচ্ছে। কানে দিয়ে বলে উঠলেন, ইয়েস, জামসেদ ওয়াদিয়া স্পিকিং—

বলার সঙ্গে সঙ্গে মুম্বাইয়া ফিল্মি হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে ভয়-ধরানো গালাগালি, থ্রেটনিং ভেসে এল। —শুয়ার কা বাচ্চা। সান অফ আ বিচ—

ফোনটা কান থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিলে সেই ঝাঁঝাল গালাগালি খানিকটা ফিকে হয়ে যায়, অন্তত ডেসিবেলের হিসেবে। না হলে মনে হয় এই বুঝি ফেটে যাবে কানের পরদা।

গাঁক গাঁক করে ভেসে আসছে সেই সব বাছাই বাছাই খিস্তি।— গিরাউঙ্গা তুমকো। জরুর গিরাউঙ্গা। কোই নেই বচানে আয়েগা তুমকো। পুলিশ! কেয়া করেগা ও শুরদিবালে! একঠো ঝাঁট ভি উখাড়নে নহি সকেগা। ভাই চাহতা হ্যায়। ইয়ে মকান ভাইকা হি হোগা। হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে।

ইউ সোয়াইন! আই উইল কিল ইউ—গরগর করে বলে উঠলেন জামসেদ।

ফোনের ওপার থেকে ব্যঙ্গের হা-হা-হা-হা হাসি ভেসে এল। হাসি না বলে তাকে অট্টহাস্য বলাই বোধহয় ভালো। একটানা অনেকক্ষণ ধরে। যেমন করে সিনেমা, সিরিয়ালের ভিলেনরা হাসে। তারপর ফোনে আবার সেই চিবোনো চিবোনো গলা। —এ বুঢ়োউ, ভাইকো তু নহি জানতা। ইয়ে মকান, জমিন ও লেকেই ছোড়েগা। আব ভি ওয়াকত হ্যায়। পইসা লেকে মকান, জমিন তু ছোড় দে। ছোড়কে ইয়ে শহর ছোড়কে কঁহি ভি চলা যা তু। কঁহি ভি—নহি তো বেমওত মারে যাও গে তুম। একদম খাললাস—হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে।

ইউ সোয়াইন! বাসটার্ড—আই উইল কিল ইউ!

তুম কেয়া মারো গে মুঝে বুডঢা গিধ! আখির তুম মরোগে। ইয়ে মকান ভি ভাইকা হি হোগা। সব সে আচ্ছা তো য়ো থা ভাই যো রোকড়া দে রহে হ্যায়, উসকো লেকে খুশি সে ভাগ যানা।

ফোনটা একটু জোরেই কেটে দিলেন জামসেদ। এমনই হচ্ছে ইদানীং। গত সাত-আট মাস ধরে। তারপর অজানা গানম্যানদের গুলিতে ব্রড ডে লাইটে এরুচশার মৃত্যু। কিছুই হলো না এখনও। ধরাও পড়েনি কেউ। ভাবতে ভাবতে জোরে পেচ্ছাপ পেয়ে গেল জামসেদের। আজকাল এই এক হয়েছে। ঘন-ঘন পেচ্ছাপ পায়। অথচ বসলে যে ভালো করে হয়ে যাবে, তাও হয় না। কুঁতে কুঁতে করতে হয়। প্রস্টেটের সমস্যা হবে

হয়তো। আরও কত যে প্রবলেম। বুড়ো হওয়ার মতো বাজে জিনিস আর নেই। ভাব
ভাবতে সামনে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলেন জামসেদ। ইউরিনাল অব্দি যেতে গে
প্যান্টেই পড়ে যেতে পারে। আজকাল মাঝে মাঝে এমন হয়। প্যান্টে বা পায়জাম
ইউরিন ড্রপ। খুব অস্বস্তি হয় তখন। লজ্জাও লাগে। খালি মনে হয় বুড়ো হয়ে গেলা
বড্ড বুড়ো!

ঘাসের ওপর পেচ্ছাপ করতে করতে খানিকটা আরাম পেলেন জামসেদ। কি
ইদানীং প্রতিবারই যেমন হচ্ছে, তেমনই মনে হলো—পুরোটা হলো না। ব্লাডারে বে
কিছুটা ইউরিন বুঝি থেকেই গেল।

কিছু করার নেই। কুলথ কলাইয়ের জল সকালে খালি পেটে খেতে বলে
ক্যালকাটা ক্লাবের সুবীর দত্ত। সুবীর নাকি খুব উপকার পেয়েছে। মদের আড্ডায় এ
অনেক কথাই হয়। আবার ভেসেও যায়। কিন্তু সুবীরের কথা মনে ছিল। আস
শারীরিক কষ্টের ব্যাপার তো! সরস্বতীকে বলাতে করেও দিয়েছিল কয়েক দিন। কি
ঐ এক ঝামেলা। ভোরে উঠে খালি পেটে খাওয়ার কথা মনে থাকে না।

কত কি খাওয়া শরীর ঠিক রাখার জন্য। নিয়মিত সব কিছু এগিয়ে দেয় সরস্বতী
কাঁচা হলুদ। এক কোয়া রসুন। মধু দিয়ে পাতিলেবু। কালো চা। রোজ রোজ কত অ
পারা যায়!

পেচ্ছাপ করে উঠে আকাশের দিকে তাকালেন জামসেদ। এখনই রোদ বে
জোরালো। একটু পরে আর একেবারেই তাকানো যাবে না। তখন ঘরে ফিরে যাও
যেমন চিড়িয়াখানার নকল গুহাঘরে ফিরে যায় বন্দি বাঘ! লুকিয়ে থাকে অন্ধকা
তেমন করে থাকা।

সরস্বতীর স্বামী মাঙ্গেলাল থাকে এখানে। এ বাড়ির দেখাশোনা করে। মাঙ্গে অ
সরস্বতীর দুটো ছেলে একটা মেয়ে। বড় ছেলেটা আমার গাড়ি চালায়। নাম সুনী
ছোটটা রাজেশ। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। ওয়ারিংয়ের কাজ করে। পাখা, ফ্রিজ, টিভি সারা
জানে। সুনীল সবার বড়। এখন বছর চব্বিশ-পঁচিশ। বিয়ে হয়ে গেছে। বউ, এব
বাচ্চা, এ বাড়িতেই থাকে। রাজেশ সবার ছোট। বছর আঠেরো-উনিশ। দুই ছে
মাঝে একটি মেয়ে। হেমা। সুনীলের বোন, রাজেশের দিদি হেমার বিয়ে হয়ে গে
এসব ভাবতে ভাবতে জামসেদ ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় আটটা। ওহো, এখ
পুরনো কয়েকটা ঘড়ির খবর নিয়ে আসবে মনীশ সরকার। আগেকার দিনের কয়ে
ওয়ালক্লক। যদি কিনে নি আমি। মাঝে মাঝে ভাবি, নতুন করে আর কিউরিও-অ্যানি
কিনে কি করব! আগ্রহ ক্রমশ কমে আসছে। যদি আর নাই বাঁচি! অজানা গানম্যা
একটা গুলিতেই যদি জীবন নিভে যায়, তখন—তখন—ভাবতে ভাবতে হাই উ
জামসেদের।

ভোর ভোর ভাইপো ফিরোজের ফোন এল গুজরাট থেকে। তারপর ফোনে থ্রী
থ্রেটনিং। ভাবতে ভাবতে আবারও হাই তুললেন জামসেদ ওয়াদিয়া। তারপর ফো

রোজের বলা সেই মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলা আমগাছ নতুন করে তাঁর চোখের মনে ভেসে উঠল।

এবার কি একবারে কাটা পড়বে আমগাছ! আর সে বেড়ে উঠবে না মাটির ওপর য়ে চলতে চলতে!

ভারতে—এই ভারতের মাটিতে পার্শিরা এসে পৌঁছয় ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে।

নিজের বাড়ির উঠোনে অন্য অন্য দিনে যেমন হয়, আজও তেমনি সেই কাঠের চীন পালতোলা বড় নৌকোটিকে দেখতে পেলেন জামসেদ।

একি, আপনারা এসে গেছেন!

এলাম তো।

বারবার দেখা হয় আপনাদের সঙ্গে। হে আমার অগ্নি-উপাসক পূর্বপুরুষেরা! পনারা ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হরমুজ বন্দর থেকে নৌকোয় চড়ে রওনা দিয়েছেন। বলতে লতে জামসেদ হাতের উল্টো পিঠে তাঁর মুখের ঘাম মুছলেন।

সামনে কেমন কুয়াশার পাতলা ঢাকনা। প্রথম ভাদ্রের রোদ একটু একটু করে বেড়ে ঠতে থাকে। কিন্তু তার তেজ তেমন করে ছুঁতে পারে না জামসেদকে। সেই হি—টু-হি বলে ডাকা পাখিটি কোন মন্ত্রবলে যেন চুপ। শুধু হাওয়ায় এখন কি এক না গন্ধ। সে ঘ্রাণ কি সমুদ্রের? সাগর পেরিয়ে আসা পালতোলা কাঠের নৌকোয় মুদ্র-নুনের দাগ। কারুকাজ করা বড় নৌকোটিকে আবছা মতো দেখতে পাচ্ছেন মসেদ। আর সেই নৌকোটাকে—শুধু একটা নয়, অনেকগুলো নৌকো নিয়ে একটা র—বেশ কয়েকটা নৌকো সার বেঁধে এক সঙ্গে রওনা দিয়েছিল হরমুজ বন্দর কে।

পথে উত্তাল সাগর। দুর্যোগ-ভরা আবহাওয়া।

গাছের পাশে পাশে সেই সব প্রাচীন পারসিক অভিযাত্রীরা দাঁড়িয়ে। তাঁদের মুখ চান আবছা কুয়াশার আড়ালে। শরীরও অনেকটা তাই। মুখ মুছে যাওয়া সেইসব চীনদের মাথায় শাদা টুপি। সেই টুপিতেও বিকেল ফুরিয়ে আসা শীতের আবছা র। তবু শাদা টুপিটি আর থুতনিতে, গালে দাড়ির আবছা বর্ডার জেগে থাকে। মনকি তাঁদের সেই ঢিলেঢালা পোশাকও খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা যায় না।

জামসেদ মনে মনে বিড়বিড় করেন, আজ থেকে প্রায় বারশো চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ র আগে কোহিস্তানের গোপন গুহা থেকে আপনারা বেরিয়ে এলেন। সেখানেই কিয়ে ছিলেন এতদিন!

হ্যাঁ, সেই আবছা আবছা হয়ে দাঁড়ানো টুপি দাড়ি ঢিলেঢালা পোশাকরা এক এক রে বলছে, ঐর্যানাম বা আরিয়ানাম, অর্থাৎ আর্যানাম, মানে—

মানে হলো গিয়ে আর্যদের দেশ। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন মেহগনির জিচেয়ারে এলিয়ে থাকা জামসেদ ওয়াদিয়া।

এই তো তুমি তো বেশ জানো দেখছি।

না জেনে উপায় কি! বুড়ো তস্য বুড়ো—আরও বুড়ো ঠাকুরদা!

হিসেবটা ঠিক হলো না। ওটা আরও অনেক তস্য তস্য তস্য না হলে মিলবে না কিছুতেই।

তাহলে তস্য তস্য তস্য তস্য বুড়ো ঠাকুরদা—

বাদ দাও ঐ তোমার তস্য তস্য তস্য তস্য—আরও তস্যর হিসেব। মোদ্দা ব্যাপারটা হলো—

হ্যাঁ বলুন।

বলতে তো চাইছি। কিন্তু তুমি বলতে দিচ্ছ কই? সেই কবে থেকে অনর্থক বকবক করছ। বড্ড বক্তিয়ার হয়েছ তুমি। বুড়ো হলে বোধহয় এমনই হয়। বেশি কথা বলে। বলে বেশ জোরেই ধমকে উঠলেন জামসেদকে, সেই কুয়াশা কুয়াশা ছায়াদের একজন।

ঐর্যানাম বা আর্যানাম—মানে আর্যদের দেশ—এই ছিল আমাদের আদি বাসভূমির পরিচয়। আমরা আলোর উপাসক। অগ্নিপূজক। অহুরা মাজদা — আলোর দেবতা—তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

সেই ছায়াময়দের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন জামসেদ, ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরান জয় করে নিল আরবরা। সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। ভয়ানক লড়াই। অগ্নি পূজকদের সরিয়ে নবীন ধর্ম ইসলাম ঢুকে পড়ল।

জামসেদ দেখতে পাচ্ছেন পরাজিত, হতমান অগ্নিপূজক পার্শিরা পালাচ্ছেন। দূরে দূরে। গোপনে নিজেদের প্রাণ, ধর্ম রাখার চেষ্টা করছেন। হেরে যাওয়া অগ্নি-উপাসকরা নিজেদের লুকিয়ে রাখলেন কোহিস্তানের গুহায়, পাহাড়ের আড়ালে। সেখানে খুব গোপনে নিজেদের ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখলেন তাঁরা। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

কোহিস্তানের গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন অগ্নি-উপাসকরা। তারপর তাঁরা হরমুজ বন্দর থেকে নৌকো করে অজানা সমুদ্রে ভেসে পড়লেন।

ছায়াময় শরীরেরা বড় বড় গাছের আশপাশে, একটু বুঝি আড়াল নিয়েই দাঁড়িয়ে তাদের মুখ থেকে 'ঐর্যানাম' বা 'আর্যানাম' শব্দ দুটো বারবার শুনতে পাচ্ছিলেন জামসেদ।

সেই না দেখা পাখিটা কোন আড়াল থেকে যেন টু-হি-টু-হি বলে ডেকে উঠল তার সুরে মনটা একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে চাইল জামসেদ ওয়াদিয়ার।

পাখিটা ডেকেই চলেছে।

তাকে দেখা যাচ্ছে না কিছুতেই। সেই ছায়া-ছায়া শরীরদের কাছে জানতে ইচ্ছে করছে জামসেদের—৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আরবরা দখল করে নিল ঐর্যানাম। অগ্নি-উপাসকরা পালিয়ে, লুকিয়ে রইলেন কোহিস্তানের পাহাড়ের গুহায়। ৬৪১ থেকে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ অব্দি। যতদিন না তাঁরা পালতোলা কাঠের নৌকোয় হরমুজ বন্দর থেকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাসের পর মাস নোনা জল আর ঢেউ ঠেলে ঠেলে এসে পৌঁছলেন কাথিয়াবাড়ের দিউয়ে। তারপর সেখান থেকে বোম্বাইয়ের ১৩০ কিলোমিটার উত্তরে গুজরাতের উপকূলে এসে হাজির হলেন। সেটা ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আরবদের আক্রমণ থেকে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ অব্দি—এই ১২৫ বছর ...রে কেমন করে কোহিস্তানের পাহাড়ে পাহাড়ে, পাহাড়ের গুহায় নিজেদের আড়াল ...রে রাখলেন অগ্নিসাধকরা? ঘরগেরস্থি করলেন। খাবার যোগাড় করলেন। তাঁদের ...শধারা ছড়িয়ে পড়ল, বাড়ল কীভাবে? কেমন করে আগ্রাসী বিদেশি আক্রমণ থেকে ...াত্মগোপন করেছিলেন তাঁরা? কোন মন্ত্রবলে? নিজের মনে এইসব জিজ্ঞাসার টুকরো ...ড়ে দিতে দিতে জামসেদ সামনে তাকালেন। এক-আধ বছর তো নয়, দশ-বিশ ...াশও না। টানা একশো পঁচিশ বছর। কি সেই আড়াল, যা তাঁদের ঢেকে রেখেছিল ...দেশি আক্রমণকারীদের কাছ থেকে! কি সে আবরণ? ভাবতে ভাবতে মাথার ভেতর ...বল তোলপাড় হয়।

সামনে তাকিয়ে তিনি ঐসব প্রায় মুছে যাওয়া শরীরদের দিকে তাকাতে তাকাতে ...াবেন এই একশো পঁচিশ বছর তো গেল। তারপর পাল ওড়ান, দাঁড় বাওয়া নৌকোয় ...৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত—এই প্রায় কুড়ি বছর। প্রথমে কাথিয়াবাড় ... কাথিয়াওয়াড়ের দিউ। তারপর সেখান থেকে বোম্বাইয়ের একশো তিরিশ ...কলোমিটার উত্তরে গুজরাতের উপকূল। খুবই জটিল অঙ্ক। খুব জটিল। মনে মনে বলে ...ঠলেন জামসেদ। আর তখনই তাঁর উঠোনে দীর্ঘ গাছেদের পাশে পাশে, আড়ালে ...ড়ানো সেইসব প্রায় মুছে আসা শরীরদের ভেতর থেকে কে একজন বলে উঠল, ...রানে— আসলে এখনকার নাম বললে ইরানই বলতে হয়, তার নাম তো ছিল ...র্যানাম, সে তো কতবারই বললাম। শুনে শুনে বোধহয় হাল্লাক হয়ে গেলে তুমি। ...ান পচে গেল। কিন্তু তবু বলতে হয়। নিজেদের শিকড়, মূল ধরার গতিপথ বলা ...আমাদের কর্তব্য।

বলুন না। খুব শান্ত গলায় বলল জামসেদ।

ঐর্যানাম বা আর্যানাম, যাই বলি না কেন, এখানে যারা থাকত তারা পারস, পার্স বা ...ারসিক। তারা স্থানীয় আর্য জাতির একটি শাখা মাত্র! মহাভারতের যুদ্ধে অংশ ...িয়েছিল পারসিকরা। পারস্যের সম্রাট দারেইওস বা দারায়ুস জয় করে নিয়েছিলেন ...ঞ্চ নদীর দেশ—পাঞ্জাব।

দারায়ুস বা দারেইওসের কাহিনী জানি।

কাহিনী নয়, সত্যি ঘটনা।

হ্যাঁ, তাইতো।

এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

বলুন। এটুকু বলেই আবারও না-দেখা পাখির ডাক শুনতে পেলেন জামসেদ। — ...-হি-টু-হি—টু-হি।

পরে পশ্চিম ভারতে ইরানি জাতির সাসানীয় ও শক রাজ্যপাল ছিল।

পাখিটা না থেমে ডেকে যাচ্ছে। ডাকতে ডাকতে এবার সবুজের আড়াল থেকে হাত ...ানেক লম্বা একটা পাখি বেরিয়ে এল। কী সুন্দর তার রঙ। সারা গা উজ্জ্বল কমলা।

গলায় কালো দাগ। ঠোঁটটি টুকটুকে লাল। মাথায় কালো ঝুঁটি। দু'চোখও লাল অসাধারণ রূপ। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

একটা পাখি নেমে এসেছে সবুজ ঘাসে। তারপর আরও একটা। তারপর আরও এক পাখি। তিনটি পাখি তাদের রঙের মাধুরি ছড়িয়ে দিতে দিতে নাচছে। সুর করে ডাকছে। দেখতে দেখতে জামসেদ মুগ্ধ। আর তখনই পাখিদের একজন কথা বলে উঠল পারিষ্কার মানুষের গলায়, পশ্চিম ভারতে সাসানীয় ও শক রাজ্যপাল ছিল, সে তো বলেছি আগেই।

এবার আকাশ থেকে পড়ার পালা জামসেদের। স্পষ্ট কথা বলছে পাখি। একদম যেভাবে মানুষ বলে। তার মানে এতক্ষণ আড়াল থেকে কথা বলছিল এই পাখিরা' তাহলে টু-হি-টু-হি—টু-হি বলে ডাকছিল কারা? আর কুয়াশা কুয়াশা আলো-আঁধারিতে তৈরি মুখ মুছে যাওয়া ঐসব চেহারা—বুড়ো ঠাকুরদার বুড়ো ঠাকুরদার বুড়ো ঠাকুরদার—তস্য তস্য তস্য—এমন কত তস্য—কত পুরুষ আগের সেইসব লোকজন— তাদের হয়ে কথকতা করবে কি এইসব পাখিরা? যাদের একজন বলে উঠল—শক পুরোহিতরা পরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় হলেন।

একদম যা বলছে, তাই শোনা যাচ্ছে হুবহু। তাহলে কি এইসব রঙদার পালক ঠোঁটেরাই কি বুড়ো ঠাকুরদার বুড়ো ঠাকুরদার বুড়ো ঠাকুরদার তস্য তস্য তস্য পূর্বপুরুষ। ঠিকমতো বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে জামসেদ শুনতে পেলেন কারও কারও মতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় জাতি থেকেই বঙ্গদেশের সেন রাজবংশের উদ্ভব হয় সেন রাজবংশ মানে বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, কুলিন প্রথা। আঠেরো অশ্বারোহীর বঙ্গ বিজয়ের কাহিনী। তুর্কি আক্রমণে পরাজিত লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গে ইতিহাসের ছেঁড়া ছেঁড়া পাতারা জামসেদ ওয়াদিয়ার চারপাশে ফরফর ফরফর করে উড়ছিল। তাদের গা-থেকে উড়ে আসা পুরনো পুরনো গন্ধ টের পেলেন জামসেদ এই গন্ধে মন কেমন করে ওঠে।

কমলা রঙের তিনটি পাখি তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছে। কথা বলতে বলতে ছোট ছোট উড়ানে চলে যাচ্ছে একটু দূরে। আবার কাছে এসে বসছে। তাদের চলাফেরা, ঘোরা, ডানা ঝাপটানিতে নাচের ছন্দ।

এই পাখিরাও কি ছিল ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের পর কোহিস্তানের পাহাড়ে, গুহায় পাহাড়ের আশপাশে? পবিত্র আগুনের সেই মন্দির, তার আশপাশেও কি ছিল এরা ভাবতে ভাবতে কেমন একটু ঢুলুনি এল জামসেদ ওয়াদিয়ার। মেহগনির সাবেক ইজিচেয়ারে মাথাটা এলিয়ে পড়তে চাইল। একমাথা শাদা—পাকা চুল। যেন-বা কাশ ফুটে আছে শরতের নদীকূলে কিংবা বালির ঢিবিতে। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো চৌকো ভারী মুখ। নাকের নিচে পুরুষ্টু পাকা গোঁফ। সেই শাদা গোঁফের ছুঁচলো দুটি প্রান্ত খুব যত্নে মোম দিয়ে মাজা। চওড়া গোঁফ দেখলে কোনো রিটায়ার্ড কর্নেল বা ব্রিগেডিয়ারের কথা মনে পড়তে পারে। বাঁ গালে একটা বড় কালো আঁচিল। তার গায়ে

জেগে থাকা তিনটি লোম। একসময় তারা কালো ছিল। এখন অনেক, অনেকটা সময় পার করে এসে শাদা। সময়ে সময়ে সেই শাদা বড্ড খোঁচা দেয় চোখে। মন খারাপ হয়ে যায়। তাই মুখের সামনে হাত-আয়না ধরে সেই কালো রঙের আঁচিলের গায়ে উজিয়ে ওঠা লোমেদের ছোট শন্নায় খামচে তুলে ফেলতে পারলে মনে শান্তি।

আয়নার গায়ে সেই আঁচিলের গায়ে জেগে ওঠা শাদা রোমরাশি দেখতে দেখতে হঠাৎ কালো পাথরে মাথা তোলা কোনো লতার কথা মনে হতে পারে। কিংবা আর কিছু। কিন্তু সেসব কথা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এখন এই যে তিনটি রঙদার পাখি, যারা 'ওয়াদিয়া ম্যানসন'-এর সামনের ফাঁকা ঘাস-জমিতে পোকা, ফড়িং, কেঁচো, কেন্নো কিছু না খুঁজে, একলা একলা বা দোকলা দোকলা সবুজ ঘাসের ওপর পায়চারি, লাফঝাঁপ বা রুটমার্চ অভ্যাস না করে, শুধুই ঘুরপাক খাচ্ছে জামসেদ ওয়াদিয়াকে ঘিরে। যেন খুব আস্তে আস্তে বলছে, আমি মানি জানি না/ পরের ছেলে মানি না। বলতে বলতে ঘুরপাক দিচ্ছে। ঘুরন চাকি হয়ে ঘুরছে আর বলছে। বলছে আর ঘুরছে। কিংবা ওসব আনি মানি জানি না/পরের ছেলে মানি না ফানি না—এসব কিছুই বলছে না। ঘুরছেও না। সবই হয়তো মনে হচ্ছে জামসেদের।

এসব ভাবতে ভাবতে নিজের ভারী মাথাটি মেহগনির ইজিচেয়ারে আলতো করে রেখে দিলেন জামসেদ। কোহিস্তানের পাহাড়, গুহা, অগ্নিমন্দির—সব একটু একটু করে পেনসিলে আঁকা হালকা হালকা রেখা হয়ে তাঁর সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আসছে। আসছে যাচ্ছে।

কোহিস্তানের পাহাড়, গুহার ভেজা-ভেজা পাথুরে গন্ধ যেন একটু একটু করে জড়িয়ে যেতে থাকল তাঁর মাথার ভেতর। কত, কত বছর আগে—নিজেদের ধর্ম, জীবন বাঁচিয়ে একশো পঁচিশ বছর ধরে লুকিয়ে থাকা। বংশ বৃদ্ধি করা। প্রাচীন অথবা নবীনদের মৃত্যু হলে টাওয়ার অব সাইলেন্সে কিংবা যাকে বলে দখমা—সেইখানে রেখে আসা। ভাবতে ভাবতে একটু শিউরেই যেন আধোঘুমে পাশ ফিরলেন জামসেদ। ইজিচেয়ারের ওপর তাঁর শরীর আলগা হয়ে এল। তখনই ফোন বেজে উঠল আবার। সামান্য দ্বিধা-সংশয় নিয়ে ফোন ধরে হ্যালো, ওয়াদিয়া স্পিকিং বলতেই ওপার থেকে মনীশ সরকারের গলা পাওয়া গেল।

কাজে আটকে গিয়ে মনীশ আজ আসছে না।

দুই

ঠাকুরপুকুরে যাওয়া বেশ ভজকট। বিশেষ করে ওয়াদিয়া ম্যানসন থেকে। এমনি নিজের গাড়ি থাকলেও। গাড়ি চালিয়ে ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে আসতে প্রায় ঘণ্টা লেগে যায়। ডায়মন্ডহারবার রোড বড্ড জ্যাম থাকে। একটু ঘুরে বেহালা চৌরাস্তা হয়ে গেলেও সেই ডায়মন্ডহারবার রোড ধরতে হয়। বাস, লরি, মিনি, ট্যাক্সি, প্রাইভেট দাঁড়ালে আর নড়তে চায় না। সময় চলে যায়। কিন্তু হরিদেবপুর যাওয়ার

রাস্তায়—সিরিটি, কেওড়াপুকুর দিয়ে ঢুকলে অনেকটা ফাঁকা। কিন্তু টালিগঞ্জ ট্রামডি
পেরিয়ে হরিদেবপুর রুটে গাড়ি ঢোকালে অনেকটা বেশি তেল পোড়ে। আর তেলে
যা দাম!

গাড়ির আয়নার কাচে—রিয়ার ভিউ মিরর-এ পেছনের, পাশ দিয়ে চলা না
গাড়ির ছায়া ভেসে ওঠে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এখন কত রকমের মডেল। ক
কত কোম্পানি। মারুতি ভ্যান, মারুতি জেন, বোলেরো, মাতিজ, স্যান্ট্রো, টয়োট
কোয়ালিস, টাটা সুমো, সিয়েলো, মহিন্দ্রা জিপ, আরমাডা, হুনড্রি। ভাবতে ভাব
স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দিলেন জামসেদ। অ্যামবেসাডার, ফিয়াট—একটু যেন কোণঠাস

রাস্তা জুড়ে গাড়ি। যেখানে যাও গাড়ি। সবাই গাড়ি কিনে ফেলছে। কার লোন নি
ঝপাঝপ কিনে ফেলা। জিরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট—বিজ্ঞাপন ফুটে ওঠে কাগজে। বাং
কাগজেও 'গাড়ি বাজার' বলে আলাদা করে বিজ্ঞাপন বেরোয়, এমন কথা শুনে
ক্যালকাটা ক্লাবের আড্ডায়।

ফিয়াট চলে। জামসেদ ওয়াদিয়া বেশ আস্তেই চালান। কারণ তিনি জানেন—খু
জোরে, উড়ে গেলেও কোনো-না কোনো সিগন্যালে আটকে যেতে হবে। লাল চে
দেখানো আলো। ব্যস, দাঁড়িয়ে যাও চুপচাপ। নয়তো জ্যাম। জ্যাম। এত গাড়ি বাড়
কিন্তু নতুন রাস্তা কই! বড় বড় চওড়া রাস্তা। লম্বা-চওড়া হাইওয়ে। একদম ভাঙাচো
নেই। তার ওপর দিয়ে হু-হু করে ছুটে যাবে গাড়ি। স্টিয়ারিং ছুঁলেই অনেক-অনে
মাইল। যেমন বিদেশে হয়।

পাশ দিয়ে একটা 'কোয়ালিস' চলে গেল। আহা, কি রূপ! সিলভার কালারে
ওপর সূর্যের আলো পড়ে মনে হচ্ছে হলিউডের ছবিতে দেখা কোনো বিদেশি বিমা
যেমন তার সৌন্দর্য, তেমনই রঙ। দশ জন বসতে পারে বেশ নিশ্চিন্তে। প্রায় সাত লা
টাকা দাম। তবু তো গাড়ি কিনছে মানুষ। চালাচ্ছে। চড়ছে। কারা কেনে এইসব গাড়ি
টাকা পায় কোত্থেকে? কারা যোগায় টাকা! কারা! কি তাদের সোর্স অফ ইনকাম! ক
টাকা আছে! কত? এরাই কি —এই হঠাৎ টাকা-করা বড়লোকদের কেউ কেউ
ফোনে হুমকি দেয় আমায়—'ওয়াদিয়া ম্যানসন' আর তার সাত কাঠা জমি ছে
দেওয়ার জন্যে? এমনকি ভয় দেখায় খুনের! এরাই কি—এই হঠাৎ হাতে টাকা পাও
লোকজনই কি খুন করেছে এরুচশাকে? এমনকি তারা যখন-তখন আমাকেও—
ভাবতে ভাবতে নিজের ফিয়াট-এর স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দিলেন জামসেদ।

যে গ্যারাজে গাড়ির বডি রঙ করাই, রিপেয়ার হয়, সেখানকার মেকানিক সুলেম
খুব ভালো গাড়ি বোঝে। এবার—এই তো মাস ছয়-সাত আগে গাড়ির বডি যখন র
করালাম বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করে, তখন সুলেমান বলল, এবার এক
মারুতি নিন স্যার।

ঐ মুড়ির টিন! যে গাড়ি টোকা দিলেই বেঁকে যায়! জোরে একটা লাথি মার
তুবড়ে তাবড়ে একসা হবে! সেই গাড়ি কিনব আমি!

তাহলে স্যান্ট্রো, হুনড্রি বা মাতিস। সুলেমান আমার ফিয়াটের গায়ে পুটিং মারতে মারতে বলে।

ও সবও তো একই রকম। সব এক চড়ের খদ্দের। জোরে একটা ঘুষি মারলে তুবড়ে-তাবড়ে জট পাকিয়ে যাবে। বলতে বলতে আমি হাসি।

আসলে স্যার তেল কম খায়। আর তেলের যা দাম এখন! ভাবলেই ভয় লাগে। তাছাড়া কলকাতার রাস্তায় বড় গাড়ি নিয়ে বড্ড মুশকিল। সাইডে রাখা যায় না। পার্কিংয়ের ঝামেলা। সেখানে ছোট গাড়ির সুবিধে। সরু গলিতেও দিব্যি চলে যায় মারুতি।

কিন্তু বড্ড ফঙ্গবেনে—অপলকা গাড়ি।

তাহলে একটা টাটাসুমো—

দূর! অত বড় গাড়ি নিয়ে কি করব আমি! একা মানুষ।

তা অবশ্য ঠিক। তবে স্যার সুমোরও একটা প্রবলেম আছে। ওর টাইমিং বেল্টটা বেশ কমজোরি। হঠাৎ যদি রাস্তায় ছিঁড়ে যায়, তাহলে বারোটা বেজে গেল। কনট্রোলে থাকবে না গাড়ি। সব গাড়ির পিনিয়ন বা দাঁত আছে। সুমোরই খালি টাইমিং বেল্ট। ফলে ঝুঁকি থেকেই যায়। সাড়ে পাঁচ পৌনে ছ'লাখ টাকার হাতি তখন পাগল হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে অনেক ভালো আরমাডা, নয়তো বোলেরো। আর 'কোয়ালিস' যদি কেনেন স্যার। আহা, দেখতে হবে না। বলতে বলতে ফিয়াট-এর পুরনো বডিতে পুটিং মারে সুলেমান। রঙ করার আগে ফিনিশ করছে বডির কাজ। আর ওর কথা শুনতে শুনতে জামসেদ ওয়াদিয়ার সামনে দিয়ে দৌড়ে যায় পুরনো দিনের বুইক, ল্যান্ডমাস্টার, অস্টিন, বেবি অস্টিন, ওপেল, হিলম্যান, ফোর্ড প্রিফেক্ট, ইম্পালা, শেভ্রেলো—আরও কত কত হাওয়াগাড়ি।

স্টিয়ারিং মুচড়ে রাস্তার একপাশ দিয়ে, ফুটপাথ ঘেঁষে চলতে চলতে প্রায় ফুটপাথ ছেঁচে দিয়ে কোনোরকমে বেঁচে গেলেন জামসেদ। আচমকাই একটা দৈত্য চেহারার টাটাসুমো তাঁর ফিয়াটকে প্রায় থেঁতো করার মতলব নিয়ে দৌড়ে এসে পেছনে থেকে তাঁকে অল্পের জন্য ছুঁতে না পেরে ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল।

তাহলে কি আমিই টার্গেট! আমাকে মারার জন্যই গাড়িটাকে প্রায় ছুঁয়ে উড়ে গেল মেরুন রঙের টাটাসুমো। রাস্তা এখন ফাঁকা। শকুন্তলা পার্ক, মহেশতলা যাওয়ার মোড় পেরনোর পর সামনেটা অনেকখানি খোলামেলা। আর সেই মুক্ত জায়গায় দৌড়ে আসা টাটাসুমো আরও দ্রুত ছুটে আমার ফিয়াট পেরিয়ে বড্ড তাড়াতাড়ি সামনে মুছে গেল।

একটা চালু মুম্বাইয়া ফিল্মের গান ভেসে আসছিল ঐ সুমোর ভেতর থেকে। কি গানটা যেন! কি গানটা যেন—নিজের ভেতর হাতড়াতে হাতড়াতে জামসেদ ওয়াদিয়া কিছুতেই সেই তলিয়ে যাওয়া লাইনগুলো তুলে আনতে পারলেন না। আজকাল এমন প্রায়ই হয়। দু'মিনিট আগে শোনা কথা মনে থাকে না। কিন্তু বিশ-তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ-

ষাট বছর আগের স্মৃতি হঠাৎ হঠাৎ ভুড়ভুড়ি কাটতে কাটতে ভেসে ওঠে ওপরে পরিষ্কার মনে পড়ে যায় সব কিছু। আবাক হয়ে যাই। সিটের ওপর রাখা ছোট তোয়ালেতে হাত-মুখ-কপাল-গালের ঘাম মুছলেন জামসেদ। কেমন যেন মনে হলো মৃত্যু বোধহয় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। ভাবলেই হাড় হিম হয়ে আসে। ছুটে যাওয়া টাটাসুমোর ভেতর থেকে বেশ জোরে বাজা একটি হিন্দি গান ছিটকে ছিটকে আসছিল তার সঙ্গে ভারী গলায় কোনো খিস্তির ফোয়ারা ছিল কি! তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগালির বর্ষা। সবটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মেরুন টাটাসুমো যে পেছন থেকে আসছে, তা কিছুতেই ধরা পড়ল না গাড়ির আয়না—রিয়ার ভিউ মিরর-এ। আমি এতটাই অন্যমনস্ক ছিলাম! নাকি এমন চুপিসাড়ে জাগুয়ার-পায়ে এসেছে যে, একেবারেই টের পাইনি। মৃত্যু তো এভাবেই আসে। ধীর পায়ে। যেমন শিকারী চিতা। নয়তো লেপার্ড।

ওরা কি অনেকক্ষণ ধরে ফলো করেছে আমায়! নাকি হঠাৎই ডায়মন্ডহারবার রোডে উদয় হয়ে মেরে বেরিয়ে যাওয়ার মতলব। গুলিও তো করতে পারত পাশ থেকে। শার্প-শ্যুটাররা যেমন করে। ভাবতে ভাবতে কপাল-গাল-মুখ ঘেমে উঠল জামসেদের। ছোট তোয়ালেতে মুখ মুছে স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখা জামসেদ গাড়ির আয়নার কাচে চোখ রাখল।

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হসপিটালের ওপর এখন বেশ বড় করে 'ক্যানসার হসপিটাল শব্দটি লেখা আছে। অথচ বছর দশ-এগারো আগেও 'ক্যানসার হসপিটাল' কথাটি লেখা থাকত না। জামসেদের মনে পড়ল আগে অন্তত তিন জন খুব কাছের মানুষের জন্য বিভিন্ন সময়ে খেপে-খেপে তাকে আসতে হয়েছে। অনেকবার—কিন্তু পর্যায় তিনটে। তখনও ঠাকুরপুকুর এতটাই ঘিঞ্জি হয়ে ওঠেনি। এত বাস ছিল না। নতুন হাউজিং কমপ্লেক্স—যা কিনা কালীতলায় হয়েছে, আরও সব অনেক অনেক পাকা ঘরবাড়ি, তখনও হয়নি। প্রচুর ফাঁকা মাঠ, পুকুর। কাছাকাছি কয়েকটা গির্জা। কালীতলা থেকে কবরডাঙা ট্রামডিপো হয়ে ধর্মতলা যাওয়ার একটা নতুন মিনিবাসও হয়েছে।

ক্যানসার হাসপাতালের সামনে দিয়ে এখন অনেকগুলো বাস। চল্লিশের এ তো আছেই। একটা সিটিসি আছে। মিনিবাস। ক্যানসার হাসপাতাল আসার আগে থেকেই প্রাইভেট বাসের কন্ডাক্টর চিৎকার করে ওঠে, 'ক্যানসার। ক্যানসার!' এতো নিজের কানে শোনা জামসেদের।

পরশু অনেকটা সকালে—তা এই ন'টা-সওয়া ন'টা হবে, পৌঁছে ছিলেন জামসেদ নানাভাই যে কেবিন আছে তার সামনে একটা ফাঁকা মাঠ। সেখানে ভোর-ভোর রাজহাঁসেরা এসে পৌঁছে যায়। তারপর একটু বেলা পড়লে তারা দল বেঁধে জলে নামে। তখন তাদের সমবেত হংসধ্বনি শোনার মতো। আকাশের দিকে সামান্য ঘাড় উঁচু করে কি তাদের আলাপ। সেই মরালগ্রীবায় সকালের আলোবাহার অন্যরকম ছবি তৈরি করে। শাদা শাদা রাজহাঁসেদের হলুদ হলুদ ঠোঁট। সব মিলিয়ে কি আশ্চর্য

রূপমাধুরী। ফিকে শাদার ওপর ছাই রঙের ছিট-ছিট হাঁসেদের ঠোঁট খানিকটা কালচে মতো। সব মিলিয়ে দেখার মতো রূপবাহার!

সকালে রোদের তাপ বাড়লে সামনের সবুজ ঘাস থেকে রাজহাঁসেরা পুকুরের জলে নেমে এলে কিছু খুচরো পালক আটকে থাকে ঘাসের ওপর। হাওয়ায় কখনও বা উড়ে যায় খুব হালকা, ছোট পালকেরা। তখন ছবিটা বদলে যায়। পেশেন্টদের কেবিনের সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো চবুতরায় ফালি রোদ পড়ে থাকে। সেখানে দুটো বাচ্চা বেড়াল—এই সবে যাদের চোখ ফুটেছে, আর সব কিছুতেই যাদের অপার বিস্ময় আর কৌতূহল, তারা দিব্যি নিজেদের ভেতর খেলতে খেলতে তুলোর বল হয়ে গড়িয়ে যায়।

একটু দূরে তাদের মা। দিব্যি চার পা ছড়িয়ে দিয়ে রোদ মাখতে মাখতে আলসেমি করছে। চার পা টানটান করে হাই তুলছে কখনও। তার পেটের ওপর হালকা স্তনবৃন্তের আভাস এখন অনেক স্পষ্ট।

এসব কিছুকে পাত্তা না দিয়ে নিজেদের ভেতর চড়াই কিতকিত খেলছে তিনটে চড়াই। খেলতে খেলতে এইবার তারা চারটে হলো। একটু দূরে ঘাসের ওপর, যেখানে এতক্ষণ রাজহাঁসেরা ছিল, সেখানে চারটে শালিক নিজেদের পছন্দমতো খাবার খুঁজেছে।

নানাভাইয়ের পাশের কেবিনে বাংলাদেশ থেকে আসা যে রোগীটি আছে, তার অবস্থা ভালো নয়। পরশু অন্তত ভালো ছিল না। আঠাশ-তিরিশের ছেলে, পেশেন্ট। তার সারা গায়ে চার-পাঁচটা নল। বউটি ছাব্বিশ-সাতাশ হতে পারে, বাইশ-তেইশও হতে পারে—পাতলা ছিপছিপে। গায়ের রঙ পাথর-চাপা ঘাস। সেই বউটি ঠায় বিছানার পাশে বসে আছে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে। বোধহয় একেবারেই নড়ে না বিছানার পাশ থেকে। এমনকি বাথরুমেও যেতে ইচ্ছে করে না হয়তো। এমনই মনে হয় তাকে দেখে।

ছেলেটির—পেশেন্টের মা ভারীর দিকে গড়ন। সিমেন্ট-বাঁধান চবুতরায় একা একা এসে বসে থাকেন। কখনও তাঁর সামনে কাঠের রেহেলে কুরআন শরিফ। নয়তো হাতে তসবি। তসবি করতে করতে—মালা ঘোরাতে ঘোরাতে তাঁর চোখে দিয়ে জল পড়ে।

পেশেন্টের বাবা বলশালী মানুষ। পেটানো সুন্দর স্বাস্থ্য। গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে হয়তো। সেই মানুষটি প্লাস্টিকের রঙিন বদনা হাতে গোসল করে ফেরেন। গোসলের পানি তাঁর কপালে-মুখে লেগে থাকে। তাঁর পায়ের পাতার গাঁটের ওপর তোলা ঢিলে পায়জামা, গায়ে আদ্দিরের শাদা পাঞ্জাবি। কখনও চেককাটা লুঙ্গি পরেও দেখা যায় তাঁকে। বিকেলে ঘড়ি মিলিয়ে তাঁকে নামাজ পড়তে দেখা যায় নামাজ-পাটি পেতে।

আসলে পরশু সকালে আসতে হলো নানাভাইয়ের বড় মেয়ের অনুরোধে। বড় মেয়েটি ডাক্তার। হার্ট স্পেশালিস্ট। অসম্ভব ব্যস্ত। খুবই পসার তার। জমজমাট

প্র্যাকটিস। গোটা তিনেক চেম্বার করে। ছোট মেয়ে হাউজ ওয়াইফ। কিন্তু সে একটি
খুব চালু বুটিকের মালিক। ওদের বুটিকের তৈরি জিনিস এক্সপোর্ট হয় বাইরে।
নানাভাই যে হঠাৎ এমন অসুস্থ হবে আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। আমার থেকে ঠিক
আট বছরের ছোট—দারুণ ফুর্তিবাজ আর আমুদে নানাভাই মোদি। ক্যালকাটা ক্লাব,
পাঞ্জাব ক্লাব, টালিগঞ্জ গলফ্ ক্লাব—সব আড্ডায় নানাভাই সবসময় রঙিন। আর
সেখানে গ্লাস হাতে কেউ যদি আজ আই টি সি কতটা উঠল, হিন্দুস্থান লিভার উঠবে
কিনা, মাহিন্দ্রার বাজার কি পড়তে চলেছে—এসব নিয়ে সেনসেক্স-এর প্যাঁচ-পয়জার
নিয়ে কথা বলতে চায়, তাহলে কলকাতার বড় শেয়ার ব্রোকারদের মধ্যে অন্যতম
ক্যালকাটা স্টক মার্কেটের একজন টাইকুন নানাভাই মোদি অসম্ভব বিরক্ত হবে। আর
আমরা যেমন গুজরাটিতে কথা বলি, আবার ইংরেজিতেও, কিন্তু গালাগালিটা নানাভাই
হিন্দিতেই দেবে।

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ, স্টক মার্কেটে নানাভাই মোদির বিপুল প্রতাপ
বোম্বে—এখনকার মুম্বাইতেও তার লম্বা হাত। তাই অসুখটা ধরা পড়ার পর তাকে
অনেকেই মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়ালে নিয়ে যেতে বলেছিল। কিন্তু নানাভাইয়ের
মেয়েরা রাজি হয়নি। বিশেষ করে বড় মেয়ে।

অপারেশনটা কলকাতাতেই হলো নানাভাইয়ের। টেন্থ অক্টোবর। বেলভিউতে
অসুস্থ হওয়ার পর প্রথমে ছিল 'গামা'-য়। তারপর পার্ক নার্সিংহোমে। সেখান থেকে
বেলভিউ।

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের সামনেটা—ঢোকার সময় মেন গেটের বাঁদিকে
ডাবের খোলার পাহাড় হয়ে আছে। সেখানে ডাব বিক্রি করছে দু'জন। পাশেই সার
বাঁধা ট্যাক্সি, অ্যাম্বুলেন্স। পিচ-মোড়া সরু রাস্তার উল্টো দিকে ভাতের হোটেল। চা
বিস্কুট, ঘুগনি-পাউরুটি, কচুরির দোকান মেডিকেল শপ। ভাড়ায় বিছানা পাওয়া
যায়—এমন সাইনবোর্ড দেওয়া ঘর। গোটা এলাকাটা ব্যবসা আর টাকা রোজগারের
মেজাজে সবসময় টগবগ করছ। বাস ছাড়াও অটো যাচ্ছে ঘন-ঘন। কারও 'পৌষ মাস
কারও সর্বনাশ'—এই প্রবাদবাক্যটা গুজরাটিতে মনে পড়ল জামসেদের, গাড়ির কাচ
তুলতে তুলতে।

পয়লা অক্টোবরও আমরা ক্যালকাটা ক্লাবে ভরপুর আড্ডা দিয়েছি। অবশ্য কিছুদিন
ধরেই নানাভাই কেমন যেন একটু লুজ হয়ে যাচ্ছিল। কথা ঠিকমতো মনে রাখতে পারে
না। খানিক আগে শোনা জিনিস চট করে ভুলে যায়। এমন তো আগে ছিল না। আসলে
শরীরটা ভালো যাচ্ছে না অনেকদিন ধরেই। নানারকম প্রবলেম। থাইরয়েড
হাইপারটেনশন। ব্লাডসুগার। ব্লাডপ্রেশার। ফিসচুলা। তার ওপর এই ভোলা-রোগ।
নানাভাইয়ের স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে বছর তিনেক। সেটাও তার একটু দমে যাওয়ার কারণ।
কিন্তু মেয়েরা খুব দেখে। দুই মেয়েই। দু'বেলা ফোন করে খবর নেয়।

সব সময়ের জন্য একটি বছর ষোলর ছেলে থাকে নানাভাইয়ের বাড়ি—নেপালি

আর একজন কুক। সে রান্না করে চলে যায়। আসলে মা চলে যাওয়ার বছরখানেক আগে থেকেই নেপাল বাবার কিড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে থাকে। বাবার সঙ্গে মার্কেটে যায়। শপিং করে। বাবাকে হুইস্কি ঢেলে দেয়। কোনো কথা তো শুনবে না—না। তারপর মা চলে যাওয়ার পর আরও রেকলেস। এখন মনে হয় বাবা বোধহয় বাঁচার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। একটা উইশ অফ ডেথ সব সময় কাজ করে।

মা থাকতে থাকতেই বাবার ভোলা ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। টেলিফোনের ওপার থেকে নানাভাই মোদির বড় মেয়ে হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ রোজি জিজিবয় এসব বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠল।

কুল ডাউন। কুল ডাউন। বি কোয়াইট। ফোনের এপার থেকে বলে ওঠেন জামসেদ।

আর টেলিফোনের ওপারে তখনও রোজি জিজিবয়ের কান্না-মেশা গলা—আংকল, হোয়াট ক্যান আই ডু! বাবা বাজার করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। একদম ব্ল্যাক আউট। এর আগেও একবার-দু'বার হয়েছে এখন শুনছি! হাতে-পায়ে কোনো জোর নেই। বাঁ-পা টেনে টেনে কোনো রকমে বাথরুমে যায়। বাঁ হাতও কমজোরি হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, ক্লাবে একা একা বসে বসে অনেকটা কনজিউম করার পর টেবিলে যেন ঘুমিয়েই পড়ল। আমরা তো ভাবলাম নেশা হয়ে গেছে নানাভাইয়ের। ওকে বাড়ি দিয়ে এসো। ইদানীং অনেক কিছু মনে রাখতে পারত না। এই শুনছে, এই ভুলে যাচ্ছে।

আমি নেপালের কাছে শুনেছি খাবার খেয়ে, চা খেয়ে একটু পরেই ভুলে গেছে খেয়েছে কি খায়নি। তাই নিয়ে তো মাঝে মাঝে ঘামাসন তর্ক নেপালের সঙ্গে। বলতে গেলে ধুন্ধুমার লড়াই যাকে বলে। অশান্তি। বাবা খেয়ে বলে খাইনি। ওষুধও ভুলে যায়। কিন্তু তেমন ভুলো হওয়ার বয়স তো হয়নি। মাঝে মাঝে আমি তো ভাবতাম আলঝাইমার হলো কিনা! হয়ত স্মৃতিভ্রংশ-অসুখ। সব স্মৃতি মুছে গিয়ে কেবল একটা-দুটো সূত্র। বলতে বলতে নাকের জল টানল রোজি।

কুল ডাউন। কুল ডাউন। বি কোয়াইট মাই বেবি। আসলে আমি তো ভাবতাম নানাভাই নখরা করছে। ওর এই ভোলাভুলি নিয়ে আমরা বকাবকি করেছি। হাসাহাসিও। বলেছি, করোড় রুপাইয়া ডিলিং করো তুমি! আর তোমার সব ভুল হয়ে যাচ্ছে! এসব তুই কি বলছিস কি ইয়ার! এটা কোনো কথা হলো?

মাথায় একটা ব্যথা অনেকদিনই হতো বাবার। ঘর অন্ধকার করে 'অম্রুতাঞ্জন' কপালে মাখিয়ে বেশ খানিকক্ষণ শুয়ে ঘুমিয়ে নিলেই সব রিলিফ। অস্বস্তি চলে গেল। এতো আমরা দেখেছি। মা নিজে কতবার—কতদিন কপালে অম্রুতাঞ্জন লাগিয়ে মালিশ করে দিয়েছে। কপাল টিপে দিয়েছে। আমি দিয়েছি। ছোট বোন নওরোজি দিয়েছে। বাবা আবার ঠিক হয়ে কাজে বসে গেছে। অনেকটা হুইস্কি খেলেও এমন মাথা ব্যথা হ'ত।

তা বাজারে গিয়ে অজ্ঞান হলো কবে?

থার্ড অক্টোবর। ভাগ্যিস নেপাল সঙ্গে ছিল। ঐ ভারী মানুষ! পায়েও ঠিকমতো তখন জোর নেই। নেপাল ধরে না ফেললে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত। রক্তারক্তির একশেষ।

তো নেপাল ধরে ফেলল তাহলে!

হ্যাঁ আঙ্কেল। নেপাল ধরল না শুধু বাঁচিয়েও দিল বাবাকে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবার কোল্ড সোয়েট। ঠাণ্ডা ঘাম। এই কোল্ড সোয়েটটা খুবই বিপজ্জনক। কয়েক সেকেন্ড সেন্স ছিল না। একদম ব্ল্যাক আউট যাকে বলে। তারপরই সব ঠিকঠাক। খবর পেয়েই কিড স্ট্রিটে ছুটে গেছি। নেপাল ফোন করেছিল। আমি তো প্রাইমারিলি দেখে ভাবলাম হার্টের গোলমাল। ই সি জি করালাম সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ইকোকার্ডিওগ্রাম। হল্টারও। ব্যাপক গোলমাল আছে। ব্লক। ইস্কিমিক তো আগেই ছিল। বছর পনের আগে একটা ম্যাসিভ অ্যাটাক তো হয়েই গেছে। পেসমেকার বসাব এরকম একটা লাইন নিচ্ছি, টাকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। কোন নার্সিংহোমে বসাব এসব ভাবছি। এর মধ্যেই বাবা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

তখন আমি আর বাবাকে কিড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে রাখলাম না। নিয়ে এলাম আমার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে। থরো চেক-আপ করালাম মেডিসিনের ডক্টর ভট্টাচার্যকে দিয়ে। তারপর একজন নিউরোলজিস্টকে কনসাল্ট করে ই ই জি, ব্রেন স্ক্যান। আর স্ক্যান করে যা পাওয়া গেল, তাতে তো আমাদের সকলের হাড় হিম। মাথার ডান দিকে পায়রার ডিম সাইজের একটা টিউমার! তাকে ঘিরে জল। এর মধ্যে বাবার কথা বেশ জড়িয়েছে। বাঁ হাত বাঁ পায়ে কোনো জোরই নেই প্রায়। পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে হাঁটত, এখন তাও পারে না। স্টুল, ইউরিনের কনট্রোল খানিকটা লুজ হয়ে গেছে। কথা বলতে গেলে জড়িয়ে যায়। চুপ করে তাকিয়ে থাকে! মাঝে মাঝে একদম ফ্যালফ্যাল করে, যাকে বলে ভেকেন্ট লুক। খাওয়া-দাওয়ায় আগ্রহ নেই। জীবনে আগ্রহ নেই। শেয়ার মার্কেট, বুল-বেয়ার, সেনসেক্স, ক্লাব, পার্টি, গল্‌ফ খেলা—শেয়ার বাজারের ওঠা-নামা নিয়ে উত্তেজনা—সব গেছে। বেরোতেই চায় না। সামর্থও নেই। হাতে-পায়ে জোরই নেই। কেউ ফোন করলে রিসিভার কানের কাছে না ধরে মাথার সঙ্গে লাগিয়ে নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছে বাবা—নানাভাই মোদি। সেসব কথায় যে খুব পারম্পর্য আছে, তাও নয়। কিন্তু বলে যাচ্ছে।

তারপর তো অপারেশন হল টেনথ অক্টোবর। প্রথমে গামায় ভর্তি ছিল। পরে বেলভিউ। ডাঃ সন্দীপ চ্যাটার্জি অপারেশন করলেন।

তোমার তো সবই জানো আংকল। সবাই ছিলে। ডাঃ চ্যাটার্জি খুবই বড় সার্জন। অপারেশন করলেনও ভালো। কিন্তু মেটিরিয়ালটা বায়োপসির জন্যে পাঠানোর আগেই তিনি আমায় আর বোনকে ডেকে বললেন, আপনারা দুজনেই বড় হয়েছেন। অ্যাডাল্ট এনাফ। তার মধ্যে মিসেস জিজিবয় আবার ফেমাস মেডিকেল প্র্যাকটিশনার—

মেটিরিয়ালটা দেখেই আমার মনে হচ্ছে এটা ম্যালিগন্যান্ট। তবু আমি বায়োপসির জন্যে দু'জায়গায় পাঠাচ্ছি। রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হবে না। মন্তব্য করাও উচিত নয়। খুব ভালো, বড় ডাক্তার ডক্টর সন্দীপ চ্যাটার্জি। বারবার বললেন, আমি আমার জ্ঞান আর সাধ্যমতো যা যা করার করেছি। অনেক দূর অব্দি কেটে, চেঁচে বাদ দিয়ে দিয়েছি সব। যতটা সম্ভব। জলটাও বের করে দিয়েছি। এখন উনি সাময়িক রিলিফ পাবেন। কিন্তু আমাদের আসল যুদ্ধ শুরু হবে বায়োপসি রিপোর্ট আসার পর।

এর মধ্যে তো তুমি আবার পেসমেকারও বসিয়ে দিলে। জামসেদ খুব আস্তে আস্তে বললেন।

হ্যাঁ, বসিয়ে দিলাম। কোনো রিস্ক আর নিতে চাইনি। একেই হার্টের কনডিশনও খুব ভালো নয়, এই এতরকম টানাটানি, অপারেশনের মধ্যে যদি আবার একটা অ্যাটাক হয়ে যায়! তাই আর দেরি করলাম না।

খরচ তো অনেক হলো।

তা তো হলোই। বলতে বলতে রোজি আবারও নাক টানল।

নিজের ফিয়াট-এর কাচ তুলে গাড়ির দরজায় চাবি দিল জামসেদ। তার মনে পড়ল রোজি টেলিফোন করে বলেছিল, যদি তুমি সকালের দিকে একটু আসো আংকল। সকালের দিকটা আসলে বাবা একদম একা থাকে। একদম লোনলি। মন খারাপ। সকলেরই অফিস। কাজকর্ম। আমিও রোজ যেতে পারি না। এত দূর। তার ওপর চেম্বার। পেশেন্ট। এর মঝে আবার আমার নিজের আংকল—মানে বাবার ভাইদের প্রোভোকেশন।

প্রোভোকেশন, তোমার আংকলদেব! কিরকম! তাদের সঙ্গে তো তোমার বাবার—আই মিন নানাভাইয়ের দারুণ রিলেশন! তারা সবাই তো বেলভিউয়ের সামনে ছিলেন আপারেশনের দিন।

হ্যাঁ, সেসব ঠিক আছে। ভাইদের মধ্যে রিলেশন খুবই ভালো। টান-ভালোবাসাও প্রচুর। কিন্তু হলে হবে কি, ছোটকাকার যেন কি করে ধরণা হলো যে আমি বাবাকে যে চিকিৎসাটা দিচ্ছি—সেটা অত্যন্ত ব্যাকডেটেড। প্রিমিটিভ। কলকাতায় নাকি ক্যানসারের সেভাবে কোনো চিকিৎসাই নেই। বাবাকে নিয়ে যাওয়া উচিত বোম্বে—টাটা মেমোরিয়ালে—এজন্য ছোট কাকা আমার সঙ্গে রীতিমতো ঝগড়া করল। এখনও কথা বলে না ভালো করে। আসলে ছোট কাকা একজন বড় ব্যারিস্টার। সারা ইন্ডিয়া জুড়ে তাঁর প্র্যাকটিস। ওয়াইড কন্ট্যাক্টস। কলকাতায় এবং দিল্লিতে বড় বড় ডাক্তার, এম পি, মন্ত্রী—সবাই পরিচিত। ছোট কাকা চাইছিল বাবাকে প্লেনে করে মুম্বাই নিয়ে যেতে। কিন্তু আমাদের তেমন লোক বল কই! আমি আরে ছোট বোন। আমার হাজব্যান্ড, বোনের হাজব্যান্ড—তারাও তো প্রফেশনালি সাংঘাতিক বিজি। তবুও এর মধ্যেই শ্বশুরমশাইয়ের জন্য যতটা করার করছে। আমরা কিভাবে পারব! একটা কথা বললেই

তো হলো না। সেটাকে এগজিকিউট করাও তো দরকার। কাকা তো বলেই খালাস। মুম্বাইয়ে টাটা মেমোরিয়াল নয় নিয়ে গেল একবার। তারপর বারে বারে তার ফলো-আপ করা! একা সব সামলানো সম্ভব, এটুকু ম্যান পাওয়ার নিয়ে! কিন্তু সেসব আমার ব্যারিস্টার কাকাকে বোঝাবে কে! অ্যাত অ্যাডামেন্ট।

গাড়ির দরজা লক করে সামনে খানিকটা হেঁটে গেলেই পুকুর। সেই পুকুরের গা দিয়ে যাওয়া বাঁদিকের রাস্তা ধরে বেঁকে গিয়ে আবার ডান দিকে যেতে হবে। তারপর সিমেন্ট বাঁধানো সরু চবুতরা। তারপর কেবিন।

সকাল দশটা নাগাদ ট্রলি করে রেডিওথেরাপি করাতে নিয়ে যায় নানাভাইয়ের নার্স। সবাইকেই এভাবে নিয়ে যায়। দশটায় নিয়ে গেলে ফিরে আসতে আসতে প্রায় একটা। এসে তারপর দুপুরের খাওয়া। সপ্তাহে পাঁচ দিন রে দেওয়া। শনি, রবি বন্ধ। এভাবেই আঠাশটা নিতে হবে। মানে আঠাশ দিন। প্রায় ছ'সপ্তাহ।

সকালে-সকালে এলে হাত ধরে খুব কান্নাকাটি করে নানাভাই। বাচ্চা ছেলের মতো। মন খারাপ তো থাকেই। তার ওপর একটা আতঙ্ক। মৃত্যুভয়। ক্যানসার হসপিটালে ঢুকলে নিজেকেই রীতিমতো রোগী মনে হয়। মনে হতে থাকে যা যা সিম্পটমস থাকলে ক্যানসার হয়েছে বলে লোকে, সবগুলোই দেখা যাচ্ছে আমার বডিতে। ভয়ে গলা শুকিয়ে আসে। মন খারাপ হয়ে যায়।

একদিন সকালে তো রীতিমতো হাত ধরে বলেই ফেলল নানাভাই মোদি, কোনো কাজই শেষ হলো না! কত কি যে করা বাকি থেকে গেল। আর এর মধ্যেই মৃত্যু এসে গেল।

না-না—তুমি মরবে কেন! নানাভাইয়ের হাতে হাত রেখে আমি বলি। জামসেদের মনে পড়ল। খসখসে হাতের পাতা। গায়ের চামড়া এ কদিনে যেন খানিকটা কুঁচকে গেছে। রেডিওথেরাপির ফলে মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। এমনিতেই ব্রেন টিউমার অপারেশনের আগে মাথা ন্যাড়া করতে হয়েছিল। তারপর রে দেয়ার ফলে চুল কমে গেছে। মাথার ডানদিকে কানের ওপরে নীল রঙের চৌকো দাগ। দেখলেই কেমন যেন গা ছমছম করে ওঠে।

নানাভাইকে ক্যাথিটা পরানো আছে। তার ভারী, বড় গোলমুখ নিয়মিত স্টেরয়েড ইনজেকশন নেয়ার ফলে আরও গম্ভীর। আরও থমথমে। হাত ধরলে আর ছাড়তে চায় না নানাভাই। জামসেদের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। শেয়ার মার্কেটের এত বড় ব্রোকার, লক্ষ লক্ষ টাকা দৈনিক হ্যান্ডেল করে। কিন্তু অসুখের কাছে মানুষ কত না অসহায়।

কেবিনে যাওয়ার আগে ডানদিকে যে পুকুর, সেখানে এখন ভেসে আছে রাজহাঁসেরা। শাদা রাজহাঁসেদের হলুদ ঠোঁট। আর শাদার ওপর ছাই রঙের ছিটে-পড়া যেসব রাজহংস-হংসীরা আছে, তাদের ঠোঁটের রঙ কালো। এই বিকেলে, বেলা শেষ হওয়ার আগে জলে ভাসা সেইসব মরালগ্রীবায় আশ্চর্য আলোবাহার। জলের ওপরে

স্থির তারা কেউ কেউ। আর জলের আয়নায় সেইসব রাজহংসের ছায়া অসাধারণ এক ছবি। সেদিকে তাকালে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

চবুতরা পেরিয়ে কেবিনের ভেতরে যাওয়ার আগে ঘেরা স্পেসটিতে দাঁড়ালে দেখা যাবে মাথার ওপর নীল প্লাস্টিকের ঢাকনা। অ্যাসবেস্টস বা টালির বদলে ছাদের কাজে লাগানো সেই নীল প্লাস্টিক চুঁইয়ে চুঁইয়ে সকালের রোদও খানিকটা যেন নীলবর্ণ পেয়েই নেমে আসে দেয়ালে, মেঝের ওপর। অথচ কেবিনের ভেতর ঢুকে এলে তেমন আলো নেই। বরং খানিকটা যেন অন্ধকারই, বাইরের তুলনায়। দেয়ালের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ। ঘরে একটা সিলিং ফ্যান। টিভি। ফোন। টিভির দিকে পা করে শুয়ে আছে নানাভাই।

সিমেন্টের নিচু-রোয়াক তারপর আলো যাওয়া-আসা-করা নীল প্লাস্টিকের শিট ছাওয়া মেঝে, দেয়াল পেরোতে পেরোতে লাইজলের গন্ধ টের পেয়েছেন জামসেদ। সেই লাইজল-ঘ্রাণ বারেবারে যেন উসকে দেয় অসুখের স্মৃতি।

কেবিনে বসার সোফা আছে। চেয়ার। সোফায় বসলেই বাঁ দিকে বড় জানলা। সেই জানলার ওপারে খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো ফাঁকা জমির পর বিশাল বটগাছ একটা। সেই গাছের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে সূর্যের আলো নিজের মতো চুমকি বসিয়ে বসিয়ে যাচ্ছে। সোফায় বসে বসে একটা পাঁচ মাথাঅলা বড় সাপকে ফণা নাড়াতে দেখলেন জামসেদ, সেই গাছের ছায়ায়।

লোহার রেলিং তোলা তুঁতে-নীল খাটে শুয়ে শুয়ে নানাভাই মাঝে মাঝে টিভি'র দিকে অর্থহীনভাবে তাকায়। তারপর বলে, জল খাব।

এই কেবিনের লাগোয়া—অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম টয়লেট। অনেকটা সময় বসে বসে তলপেট ভারী হয়ে গেলে জামসেদ এই কেবিনের টয়লেটেই যায়। লোহার খাট তোলা-নামা করার চাবি দিয়ে নানাভাইয়ের পছন্দ ও সুবিধেমতো খাটটাকে উঠিয়ে বা নামিয়ে দেয় নার্সটি।

বটগাছের অন্ধকারে পাঁচ মাথার সাপটি তার ভারী ফণা নিয়ে দোল খায়। চেয়ে থাকে জামসেদের দিকে। আর সেই ছায়ায়-আলোয় হঠাৎই উজ্জ্বল আলোর ভেতর জরথুশত্রকে ভেসে উঠতে দেখতে পান জামসেদ ওয়াদিয়া। মাথায় পাগড়ি। মাথাভর্তি কালো চুলের ঢাল অনেকটা যেন বা নারীদের কেশভার হয়ে নেমে এসেছে পিঠের দিকে। গালে সুন্দর কালো দাড়ি। গোঁফ। বড় বড় দু'চোখে আশ্চর্য প্রশান্তি। ডান হাতটি আকাশের দিকে তোলা। বিশেষ করে তর্জনীটি। বাঁ হাতে গোমুখ সমেত সেই বিখ্যাত দণ্ড। পরনে পুরো হাতা জামা। তার ওপর চাদর জড়ানো। সেই চাদর গলার কাছে বেড় দেয়া অবস্থায় রয়েছে।

বট গাছের আবছা আলো-আঁধারিতে জরথুশত্র দাঁড়িয়ে। সেদিকে তাকিয়ে কি এক শান্তিতে মনটা ভরে গেল জামসেদের। ইনি প্রাচীন ঐর্যানামের তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ।

আমি আর পারছি না—আমায় বাড়ি নিয়ে চলো। বলতে বলতে নিজের খসখসে

হাতের পাতার ভেতর জামসেদের হাত টেনে নিতে নিতে নানাভাই বলল, আমাকে বাঁচাও। এখান থেকে আমার বের করে নিয়ে যাও। আর পারছি না। আমি কিড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাব। ও বাবা—ও বাবা—

অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই নানাভাই বিছানায় শুয়ে-বসে মাঝে মাঝেই ও বাবা—ও বাবা করে ওঠে। সেই চিৎকার শুনে আরও কষ্ট হয় জামসেদের। চোখে জল আসে। এত তাজা, টগবগে মানুষটা—সবাইকে বল-ভরসা-আশ্বাস যুগিয়ে বেড়ান পরোপকারী নানাভাই বিছানায় শুয়ে। এমন একটা অসুখ হয়েছে যে কি হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু রোজি আর নওরোজি—দুই বোন, ওদের হাজব্যান্ডদের মনের জোর অসাধারণ। বিশেষ করে রোজির তো কোনো তুলনা নেই। নিজের রোরিং প্র্যাকটিস, পেশেন্ট পার্টি, চেম্বার, সমস্ত সামলে—এই এত দূরে ঠাকুরপুকুরে ক্যানসার হাসপাতালে আসে পেশেন্ট সামলাতে।

কি ধৈর্য মেয়েটার! কতই বা বয়েস। বত্রিশ-তেত্রিশ বড় জোর। তার মধ্যে বাবাকে দু'-দুবার ঠাকুরপুকুরে ভর্তি করানো। অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসা। চব্বিশটা রে দিইয়ে বাড়ি নেয়া। তারপর আবার কেমোথেরাপির জন্য আনা।

আমায় কিড স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে চলো। একটা গাড়ি ডাকো। আমি চলে যাব কিড স্ট্রিটের বাড়ি। বলতে বলতে বিছানায় শোয়া নানাভাই তার হাত বাড়িয়ে দিল।

হাসপাতালের কেবিনে প্রিয়জন কেউ ঢুকলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় নানাভাই। শুয়ে থাকলে তার হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চায়। বসে থাকলে নিজের ভারী, ইদানীং খসখসে হয়ে যাওয়া পাতা দিয়ে অন্যের হাত স্পর্শ করে। টেপে। হয়ত জীবন ছোঁয়।

আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো। এখানে থাকলে আমি মরে যাব। বলতে বলতে লোহার বিছানায় শুয়ে থাকা নানাভাই হাত বাড়িয়ে দিল।

বট গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয়-ছায়ায় মাখামাখি হয়ে ফণা তোলা পাঁচ মাথার সাপটি তার ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে পাঁচটা মুখ থেকে চেরা জিভ বের করছে সেই সাপ। জামসেদ বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারলেন না।

গত নভেম্বরে রোজি বলেছিল রেডিয়েশানের পর—এতগুলো রে ঠিক ঠিক রিসিভ করতে পারলে তখন আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে আঙ্কেল। রে দেয়ার পর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পার্সেন্টেজ সাংঘাতিক কমে যায়। ব্লাড দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া রে দেয়ার ফলে ক্যানসারের দাঁত লাগা সেল যেমন নষ্ট হয়, তেমনই ডেসট্রয় হয়ে যায় সুস্থ সেলও। এখন ব্রেন বলে কথা। কোন সেল কতটা কি ড্যামেজ করবে বা করছে আমরা তো বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না কিছু। সবটাই ভেতরে হচ্ছে। সবার অলক্ষে।

রেডিয়েশনে চুলও তো সব উঠে যায় মাথার।

হ্যাঁ, রেডিয়েশন, কেমো—দুটোতেই মাথার চুল নষ্ট করে। তার সঙ্গে বমি ভাব, রাইগার—কাঁপুনি, এ সবও হতে পারে। তবে বাবার হিমোগ্লোবিন কমে গিয়ে কোনো অ্যালার্মিং জায়গায় দাঁড়ায়নি এখনও, বারোটা কেমো তো হয়ে গেল। বমিও হয়নি বাবার।

আসলে নানাভাইয়ের ফিজিকটা খুব ভালো। ছোটবেলা থেকে এক্সারসাইজ করত। নিয়মিত ব্যায়াম। তার সঙ্গে নানারকম খাদ্য খাওয়া। তার ওপর কুস্তিও তো লড়ত শুনেছি কম বয়েসে।

হ্যাঁ আঙ্কল। আমরা শুনেছি বাবার কুস্তি করা, মুগুর ভাঁজা। বাড়িতে দুটো কাঠের ভারী মুগুর ছিল—আমিও দেখেছি। ডান হাতে তিরিশ সেরের, বাঁ হাতে কুড়ির—এই নিয়ে বাবা ঘোরাত। সে সব কাঠের মুগুর এখন আর নেই। কোথায় যেন চলে গেছে। তবু বলছি, বাবার শরীরটা ভালো ছিল বলে প্রথম ধকলটা সামলে গেছে। এখন দেখা যাক, শেষ অব্দি কি হয়। দেখেই তো যাওয়া শুধু।

শুধুই দেখে যাওয়া বলছ কেন রোজি ডিয়ার! তোমরা করছও তো অনেক। তোমরা দুই বোন, তোমাদের হাজব্যান্ডরা—সবাই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছ। সাধ্যের অতিরিক্ত করছ। ছেলে থাকলেও বোধ হয় এত করত না। পুত্র সন্তান ছিলনা বলে সব সময় একটা চাপা দুঃখ ছিল নানাভাইয়ের। কথায় কথায় কখনও তা ফুটে বেরত। বিশেষ করে ক্যালকাটা ক্লাব, কি পাঞ্জাব ক্লাব বা টলি ক্লাবে তিন চারটে হুইস্কি নেয়ার পর মাঝে মাঝে পুরুষ-সন্তান না থাকার জন্যে কষ্টের কথা উগরে দিয়েছে নানাভাই। কিন্তু ছেলে থাকলেই কি আর তার বুড়ো বাপ-মাকে ঠিক ঠিক দেখে! না দেখতে চায়? এমনিতেই দেখ না, আমাদের পার্শিদের মধ্যে ছেলেপিলের সংখ্যা কম। অনেকেরই নেই। দত্তক নিয়েছে কেউ কেউ। সেই পালিত পুত্ররাই বিশাল ইন্ডাস্ট্রি, ব্যবসা চালায়। প্রপার্টির দেখভাল করে। সিনিয়ারের ক্যাপিটাল বাড়ায়। রোজি—ডাঃ রোজি জিজিবয়কে এসব কথা বলতে বলতে দক্ষিণ গুজরাটের ভারলি নদীর তীরে সনজান শহর থেকে এক কিলোমিটার দূরে ভিলবাদি গ্রামে বুকে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে শিকড় ছড়ান আমগাছটিকে দেখতে পান জামসেদ ওয়াদিয়া।

সেই ধনুক হয়ে বেঁকে নেমে মাটি ছোঁয়া আম্র বৃক্ষটি যেন তাঁকেই জড়িয়ে ধরে এগিয়ে আসতে চাইছে, এমন মনে হলো জামসেদের। কিন্তু সে গাছও তো কাটা পড়বে এবার। আর এগোতে পারবে না। ভাবতে ভাবতে পুরনো কথায় সুতো ধরে জামসেদ বললেন, ছেলে ছেলে করে লোকে! আমারও তো দু-দুটো ছেলে ছিল। কি হলো! থাকল তারা?

আসলে বাবা তোমাদের দেখে খুব আনন্দ পায়। খানিকটা ভরসাও। ক্যানসার হাসপাতালের কেবিন এতটাই আইসোলেটেড, বলতে গেলে কনডেমড সেলের মতো, যেখানে ফাঁসির আসামীরা থাকে। ক্যানসার মানে এখনও তো ধরেই নেয়া হয় 'নো আনসার।' অর্থাৎ একটু একটু করে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

কিন্তু আজকাল তো অনেক মডার্ন চিকিৎসাও বেরিয়েছে রোজি বেবি।

বেরিয়েছে আঙ্কল। ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। কিন্তু মানুষ বড্ড দেরি ক ফেলে। আসলে স্বাস্থ্য চেতনা—হেলথ কনসাসনেস এতটাই কম যে কি আর বল প্রথমে ছোট ছোট অসুবিধে হলে ভাবে টি বি বা অন্য কোনো ডিজিজ বুঝি। সেভা গুরুত্বই দেয় না। অথচ ক্যানসার প্রথম প্রথম ধরা পড়লে—

ঠিকই বলেছ তুমি। তবে আমি এলে নানাভাই খুব চিয়ারফুল হয়ে ওঠে।

হয়ই তো, সেজন্যই তো তোমায় একটু সকালের দিকে যেতে বলছি আঙ্কল। ক-দিন পার। জানি, তোমারও অসুবিধে। অতটা দূর থেকে আসা। নিজে গাড়ি চালি আস। সব বুঝছি আঙ্কল। পরন্তু আমার আর বাবার মুখ চেয়ে যদি একটু আসতে পা হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আমি একটু স্বার্থপরই হচ্ছি। এই সেলফ সেন্টারড হওয়া শুধুই আম বাবার জন্যে।

আমাকে দেখলে খুবই চিয়ারফুল হয়ে ওঠে।

জানি আঙ্কল। তুমি আর সুবোধ আঙ্কল ছাড়া সেভাবে তো আর কেউ খবরই ে না বাবার। ঠাকুরপুকুরে আসা তো দূরস্থান। একটা ফোন পর্যন্ত করে না। অথচ বা আড্ডার কত সঙ্গী। বাড়িতে, ক্লাবে। সেই সব সফেন আড্ডার ইয়াররা এখন কোথ কাউকে দেখি না। অথচ বাবা তো বহু আড্ডারই মধ্যমণি ছিল। এখন বাবা চায় ব বন্ধুরা সবাই আসুক। আনন্দ হোক। কিন্তু আসে না কেউ। তোমাকে আর সুে আঙ্কেলকে কুমিরছানা করে করে কত বার আমি দেখাব! এই ভাবে রোজ ম্যাটিনি ে মর্নিং শো-র অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়! আবার ভিজিটর যদি পছন্দের লোক না হ তাহলে তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে, দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকবে। শুে থাকবে! বার বার ডাকলেও কোনো উত্তর দেবে না।

এসবই কেবিনের সোফায় বসে বসে মনে পড়ে জামসেদের। সেই ঝুড়ি না বিশাল বটের আড়ালে ফণা ধরা পাঁচমুখো সাপটি একটু একটু করে তার মাথা নাড়াে চেরা জিভ বেরিয়ে আসছে পাঁচটি মুখ থেকে। আবছা অন্ধকারে সেই জিভ থে রুপোলি আলো ছুটে আসে। দেখে গা-ছম ছম করে ওঠে জামসেদের। অথচ মা পাগড়ি বাঁধা ডান হাতের তর্জনী আকাশের দিকে তোলা জরথুশত্র তেমনই স্থির। ে মুখে হাসি।

'ও বাবা—ও বাবা—বাবা'— নানাভাইয়ের গলা থেকে আবারও এসব শুন পেলেন জামসেদ। একটু একটু করে ফুরিয়ে যাচ্ছে বিকেল। যদিও ভাদ্র মাসের ে দীর্ঘ। আবার কেমো থেরাপির জন্যে ভর্তি হয়েছে নানাভাই। টেনথ অক্টোবর ে টিউমার অপারেশনের পর চব্বিশটা রে হয়ে গেছে। তখন তো বারে বারে এসে দিনে, রাতে। বিকেলে। চব্বিশটা রে নিতে পাঁচ সপ্তাহ লাগল। তখন শীতকাল।

এখন, এই গরমে—ভাদ্রের ভ্যাপসা গুমোটে ঠাকুরপুকুরের ক্যানসার হাসপাত কেবিনের ভেতর সোফায় বসে বসে নানাভাই মোদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে জামসেদ। জানলার বাইরে ঝুরি নামান বটের আলো-ছায়ায় জরথুশত্র। তার বাঁ-হাে গুটি আকাশমুখী।

সেই পাঁচ মাথাওলা সাপটি সমানে জিভ বার করে যাচ্ছে। সেই চেরা জিভে ভাদ্রের শেটা বেলার রোদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

লোহার খাটের ওপর বসে নানাভাই বলে যাচ্ছে, জামসেদ, তুমি আমার বাঁচাও ভাই। মেয়েরা কেউ আমার কথা শোনে না। তুমি আমায় কিড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে নিয়ে চল। ওখানে গেলেই আমি ভালো হয়ে যাব। ওখানে নেপাল আছে। আমার দেখাশুনো করবে। কোনো অসুবিধেই হবে না। দিব্যি বাজার করব। খাব। দাব। ঘুরব। শেয়ার মার্কেটে যাব। ও বাবা—ও বাবা—তুমি আমায় নিয়ে চল ভাই। তোমার দুটি হাত ধরছি। প্লিজ নিয়ে চল।

জামসেদের মনে পড়ল এর আগের দিন খুব গম্ভীরভাবে নানাভাই বলেছিল, আমায় একশোটা টাকা দিতে পার!

কেন?

দাওই না। দরকার আছে।

হাসপাতালে টাকা তো অ্যালাউ নয়। তাছাড়া টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ভাই?

সে কাজ আছে। দাওই না।

বেশ দেব। আগে বল, কি কাজ!

এখান থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা কিড স্ট্রিটে চলে যাব। এই যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না।

না ভাই। এ কাজের জন্যে তো আমি তোমায় টাকা দিতে পারব না। রোজি, ওরোজিরা বকবে আমায়। বকবে কি, মারতেও পারে। তোমরা জামাইরাও আমায় ছেড়ে কথা বলবে না।

ঠিক আছে দিও না টাকা। কলকাতার রাস্তায় ট্যাক্সি চাপতে নানাভাই মোদির টাকাও লাগে না। তুমি কি একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পার আমায়? এটুকু বলে মুখে গভীর বিষাদ টেনে এনে চুপ করে রইল নানাভাই। সব পর পর মনে পড়ে যাচ্ছে জামসেদের। চুপ করে থাকতে থাকতে হঠাৎই উল্টো দিকে ফিরে, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল। অনেকবার ডাকা-ডাকিতেও ফিরল না এই পাশে।

সোফায় বসে বসে সবই মনে পড়ে জামসেদ ওয়াদিয়ার। রোজি বাড়িতে ওরাল কেমোও দিয়েছিল নানাভাইকে। এখন তো ওরাল কেমোও করেন অনেকে। ক্যাপসুলের ভেতর কেমোথেরাপির ওষুধ। বাড়িতে সেই কোর্স করবার সময় রাইগার—কাঁপুনি। কনভালশান। ভয়ঙ্কর কাঁপুনি। এক রাতে তো রীতিমতো যায় যায় অবস্থা। অসম্ভব ফ্লাকচুয়েট করেছে ব্লাড প্রেসার। নিচেরটা ষাট ফাট হয়ে গেছে। ওপরেরটা আশি। সিংক করে যাচ্ছে।

রোজি বলছিল, আমি তো ভাবলাম আর রাখতে পারলাম না বোধ হয় বাবাকে। একবার কোলাপস করে গেল। হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তখন বাধ্য হয়ে ডকটর ভট্টাচার্যের সঙ্গে কনসাল্ট করে আবার ঠাকুরপুকুরে।

এখন—এই গড়িয়ে নামা শেষ বিকেলে রাজহাঁসেরা সবাই উঠে আসছে পুকুর থেকে। পাড়ে তাদের ডানা ঝাড়ার শব্দ। সেই ধ্বনির সঙ্গে উড়ে যাচ্ছে আলগা আলগা পালক। সেই সব উড়ো পাখার গায়ে ভাদ্রের পড়ন্ত রোদ ঠোকর মারছে। সবুজ ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে উড়ে মিশে যাচ্ছে সেই সব পালকেরা। শীতে সকালটা অন্যরকম থাকে একটু।

শিশিরের গুঁড়ো মাখা সবুজ ঘাসেদের গায়ে লেপটে থাকে এইসব কুচো পালক। সেই সব ঝরা পালকের দিকে তাকালে বুক ভেঙে শ্বাস পড়ে। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে এসব দেখতে দেখতে জামসেদ নিজেকে খোঁড়েন।

এখন—এই ভাদ্র বেলায় রোদ গলানো গরম ধাতু হয়ে গড়িয়ে পড়ছে নীল পলিথিন শিটে ছাওয়া ছাদের ওপর। সেই রোদ্দুরে এখনও বড্ড তাপ। সবে হওয়া বেড়াল বাচ্চারা গড়াতে গড়াতে, খেলতে খেলতে তাদের মায়ের সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে দিব্যি বেড়ে উঠছে।

চবুতরার সিমেন্ট এখন বেশ তেতে আছে। সেই তাপে কষ্ট হয়। বেড়াল-মা তার বাচ্চাদের নিয়ে কোনো ছায়ায় জিরনোর মতলবে থাকলে কি হবে, বাচ্চারা শুনলে তো! তাদের ছুটোছুটি, হুটোপাটি, খেলাধুলো অব্যাহত। ছাদের ঢাকনা চোঁয়ান নীলচে আলো তাদের পিঠে, ল্যাজে, লোমে। এসব দেখতে দেখতে কেবিনে ফিরে আসেন জামসেদ। তারপর সোফায় বসেই দেখতে পান বটের ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জরথুশত্র হাসছেন। তখনই ঘরে ঢুকল রোজি। হাতের ব্যাগ কেবিনের টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, আঙ্কল, কতক্ষণ? তারপর নিজের ঘাড়, কপালের ঘাম মুছল হালকা গোলাপি ওড়নায়।

তা হবে ঘণ্টা দেড়েক তো বটেই।

কি ভয়ানক গরম! একদম সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি— বলতে বলতে রোজি তার স্টেপ কাটে হাত ছোঁয়াল। খুব গরম পড়েছে। হয়ত এখনই বৃষ্টি হবে।

পার্ক স্ট্রিটের দিকে তো হয়েছে। আমি চেম্বার করে আসার সময় টের পেলাম। তারপরই একটু গলা তুলেই নার্সকে ডাকল রোজি। —আজ কেমো দিয়েছে?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

রাইগার হয়েছে?

না।

জ্বর এসেছিল?

না।

আজ কী খাবার খেয়েছে বাবা?

সকালে চা বিস্কিট। তারপর টোস্ট আর ডিম।

টোস্টে ভুল করে চিনি দিয়ে দেয়নি তো আগের দিনের মতো?

না, ওঁর বেডের পাশে তো ডায়েবিটিক ডায়েট—এই বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ়াতে ভুল না হয়।

দেখো, এর মধ্যে যদি ব্লাড সুগার বাড়ে, তা-লে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে।

জামসেদ নজর করে দেখল নানাভাইয়ের লোহার খাটের গায়ে ইংরেজিতে ডায়েবেটিক ডায়েট' কথা কটি ছাপা চৌকো বোর্ড ঝোলান রয়েছে। ঠিক চৌকো বার্ড বললে ভুল হবে। ঠিক ঠিক দেখলে লম্বাটে চৌকো পিসবোর্ড শাদা জমির ওপর লালে লেখা 'ডায়াবেটিক ডায়েট'। এভাবেই সেদিনের সকাল বেলাটা ফুরিয়ে গেল।

আজ কেমন আছ বাবা?

নিজের বড় মেয়ের কথার কোনো উত্তর দিল না নানাভাই।

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

বাবা! ও বাবা!

কোনো উত্তর নেই। রোজির দিকে পিঠ রেখে শুয়ে আছে নানাভাই।

বাবা! বাবা! রাগ হয়েছে! কথা বলবে না।

তুমি অত্যন্ত অসভ্য মেয়ে। আমি এখানে একা পড়ে রয়েছি। আমায় নিয়ে চল। নইলে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও। কিড স্ট্রিটের বাড়ি চলে যাব আমি। এখনে থাকব না।

ওরকম করে না বাবা। আর কটা দিন। বাড়িতে তো সব চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। ওরকম কনভালশান হলে কে দেখবে তোমায় বাড়িতে? তোমাকে দু-তিনজন মিলে চেপে ধরে রাখা যায় না। কি কাঁপুনি! বাপ রে বাপ। তারপর ওরকম ফ্লাকচুয়েটিং বিপি। সেদিন সারা রাত আমরা কি যে উদ্বেগ নিয়ে জেগে থেকেছি। রাত জাগা সে রকম কোনো ব্যাপার নয় হয়ত। ওতো রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যেই পড়ে গেছে প্রায়। কিন্তু কনভালশান আর হু-হু করে প্রেসার নেমে যাওয়া। সারা রাত ইনজেকশান পুশ করা। যন্ত্র দিয়ে বাড়িতে ব্লাডসুগার দেখা। ওফ, সে যা গেছে!

তাও তুমি আমায় নিয়ে চল এখানে থেকে। একটুও ভালো লাগছে না আমার এখানে। এখানে থাকলে আমি ঠিক মরে যাব। ঠিক মরে যাব।

ছিঃ! ওভাবে বলতে নেই বাবা! তোমাকে মেরে ফেলার জন্যে কি আমরা দিয়েছি এখানে! ডকটর গুপ্ত, এখানকার অন্য ডকটররা কত করছেন তোমার জন্যে।

তুমিও তো ডকটর। ডকটর রোজি জিজিবয়। খানিকটা জড়িয়ে জড়িয়েই যেন বলল নানাভাই মোদি।

হ্যাঁ ডকটর তো। সে তো তোমার জন্যেই হয়েছি। তুমিই তো পড়িয়েছ আমায়।

জামসেদ দেখলেন নানাভাই এবার দেয়াল থেকে মুখ ঘুরিয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছে।

টপ করে সামনে ঝুঁকে বাবার কপালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়াল রোজি। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। স্যান্ডাল সেন্ট রোজি পছন্দ করে বোধ হয়। ঘরে ঢুকলেই সেই ঘ্রাণ উড়ে আসে। ভেতর অব্দি স্নিগ্ধ হয়ে যায় চন্দন-সুবাসে।

বাইরে অন্ধকার নামছে।

আঙ্কল, তুমি চা খাবে? কতক্ষণ থেকে বসে আছ।

না থাক।

ওকে। তবে তোমায় একটা রিকোয়েস্ট করব আঙ্কল।

কি বল!

আজকে ফেরার সময় তুমি একবার আমার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি হয়ে যাবে।

কেন বেবি?

ঐ যে আমার ব্যারিস্টার কাকা আছেন না! তাঁর সঙ্গে আমার একটু মোকাবিলা হবে।

কিসের মোকাবিলা?

আমার ব্যারিস্টার আঙ্কল আসবেন বলেছেন, কি সব জরুরি কথা আছে নাকি তাঁর আমার সঙ্গে।

কিন্তু আমার যাওয়া কি ঠিক হবে? এটা কমপ্লিটলি পারিবারিক ব্যাপার তোমাদের সেখানে আমি তো একজন আউটসাইডার। একজন বাইরের লোকের কি উচিত হবে তোমাদের ফ্যামিলি ডিসকাসান অ্যান্ড ডিসপিউটে ইনটারফেয়ার করা?

তুমি আউটসাইডার হবে কেন! কলকাতার একজন গণ্যমান্য সিটিজেন তুমি। তা ছাড়া তুমি বাবার বিশেষ বন্ধু। আমাদের দুর্দিনের সাথী। বাবাকে তুমি নিয়মিত দেখতে আস। খবর নাও। ফলে তুমি থাকতেই পার। তাছাড়া কাকা তোমায় খুব ভালো করে চেনে। বলতে বলতে রোজি নানাভাইয়ের দিকে তাকাল।

আমায় নিয়ে চল এখান থেকে। ভালো লাগছে না। কিছুতেই আর থাকতে পারছি না এখানে।—ও বাবা—ও বাবা—বাবা গো—বলতে বলতে কেবিনের চারপাশে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিল নানাভাই।

তাহলে কবে আমায় নিয়ে যাচ্ছিস এখান থেকে! আর পারছি না—ও বাবা —বাবা—বাবা গো! ও বাবা!

ছেলেমানুষি করে না বাবা। এরকম আহ্লাদিপনা করলে এখন চলবে?

আমি কিড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাব। আমায় দিয়ে এস। বলতে বলতে নানাভাই আবারও দেয়ালের দিকে ঘুরে শুলো।

নানাভাই হঠাৎই আবার ফিরল এদিকে। তারপর নিজের ডান হাতটা রোজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এবার আমায় ধরে ধরে তোল।

নিজের বাবার বাড়ান হাতের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল রোজি।

রোজির হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল নানাভাই।

এর মধ্যে কখন যেন কেবিন-ঘরের আলো জ্বলে গেছে। বাইরে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার। টিউব-আলোয় কেবিন-ঘর বেশ খানিকটা অন্যরকম মনে হয়। সব কেমন যেন পাল্টে গেছে। নানাভাইয়ের মাথায় দিকের জানলার বাইরে তাকালেন জামসেদ। মাটির গভীরে শিকড় নামান বটগাছটি তখনও তেমনই ঠায় দাঁড়িয়ে।

রোজি বলল, আঙ্কল, তুমি তো আমার সঙ্গে আমাদের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি যাবে। আজ আমার ব্যারিস্টার আঙ্কল আসবে। সে তো তোমায় আগেই বলেছি। মুখোমুখি কথাবার্তা বলতে হবে। তখন তোমার একটু থাকা দরকার।

ঠিক আছে, থাকব। বলেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন জামসেদ।

বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও ঘন হয়েছে।

তিন

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে রোজির শ্বশুরবাড়ি। বাড়িটি বেশ বড় আর পুরনো। সামনে খানিকটা ছাড়া জমি। সেখানে ফুলের গাছ। ফলের গাছ। গাছের সবুজে পাখিদের ওড়াউড়ি।

সাবেক তিনতলা বাড়ি। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি কাঠের। দোতলা থেকে তিন তলায় যাওয়ার জন্যে একটা লোহার ঘোরান সিঁড়ি আছে। সরু, লোহা ঢালাই করা এই সিঁড়ি বেশ দেখতে।

একতলায় অনেক বছরের পুরনো ভাড়াটে। একতলা থেকে দোতলায় উঠে আসার সময় সিঁড়ির পাশের দেয়ালে, তারপর টানা বারান্দায় কাচে বাঁধান, কাঠের ফ্রেমবন্দি অনেকগুলো ছবি।

জামসেদ দেখতে পেলেন দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধা হয়ে হাসছেন জামসেদজি টাটা, নানাভাই দাভারে, ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার, জেনারেল মানেকশ, ফিরোজ গান্ধী। ছবির কাচে সময়ের ধুলো, মাকড়সার জাল। যেমন হয় আর কি! এসব দেখতে দেখতে বুক ভেঙে বড় করে শ্বাস বেরিয়ে এল জামসেদ ওয়াদিয়ার।

ঘরের ভেতর বেশ ছিমছাম। দোতলাতেই বসার জায়গা। ঘরের পাখা খুলে দিয়ে রোজি বলল, চা খাবে, না কফি?

এই গরমে কিছুই ভালো লাগছে না ডিয়ার। বলতে বলতে ছোট তোয়ালেতে মুখ-হাত মুছলেন। তারপর বাইরের ঘরের সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে গরমে কষ্ট পেতে লাগলেন জামসেদ।

নিচে গাড়ির আওয়াজ হলো। রোজি তার হালকা গোলাপি ওড়নায় ঘাম মুছতে মুছতে চন্দনের ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে বলল, চা-কফি কিছু খাবে না, তাহলে লস্যি বানিয়ে দি! তারপর একটু থেমে ঐ একই রকম দমে রোজি কি একটা শুনতে পেয়ে যেন বলে উঠল, ঐ বোধ হয় কাকা এল।

লস্যি বানাতে আবার ঝামেলা করতে হবে।

ঝামেলা কিসের! মিক্সিতে হয়ে যাবে সব। কতক্ষণ আর লাগবে!

ঠিক আছে কর। তোমার হাজব্যান্ড থাকবে না এই ডিসকাসানে?

নো। নো। ও আমি যা বলব, তাই হবে। আসলে কাকা বোধ হয় একটু রগড়াতে চায় আমায়।

রগড়াবে কেন?

রোজির কথা ফুরোতে না ফুরোতেই ডোর বেলের বেজে ওঠা। তারপর কোলাপসবল খোলার শব্দ।

ঐ রে, কাকা এসে গেছে। হিজ হাইনেস বাবুভাই মোদি। রোজি এসব বলতে বলতেই সিঁড়িতে টক টক টক টক করে জেগে উঠল জুতোর শব্দ।

পরদা ঠেলে বসার ঘরে ঢুকল নানাভাইয়ের ছোট ভাই বাবুভাই।

হাইকোর্ট থেকে ফিরছে বোঝাই যায়। ব্যারিস্টারদের যেমন চিরাচরিত পোশাক হয়, তেমনই। হাতের কালো ব্রিফকেসটিও আছে। বাবুভাইয়ের জুতো জোড়া খুব দামী আর অসম্ভব ঝকঝকে। কালো চামড়ায় মুখ দেখা যায় যেন।

চা খাবে, না কফি! না কি ঠাণ্ডা কিছু? সোফায় বসা কাকার দিকে তাকিয়ে রোজি জানতে চাইল।

দাঁড়া। একটু জিরিয়ে নি আগে। ওঃ! এত গরম, যে কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে করে না। খাওয়া তো দূরের কথা। তা দাদা কেমন এখন?

আগের থেকে বেটার।

বেটার মানে?

বেটার মানে প্রেসারটা আর আগের মতো ফ্লাকচুয়েট করছে না। বিপি অনেকটা নর্মাল। আর তা ছাড়া বাড়িতে ওরাল কেমো দেয়ার পর যে রকম ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছিল! ওফ, সে তো ভাবাই যায় না।

কি করছিল? জানতে চাইল বাবুভাই!

কি করেনি বল তো! ক্যাথিটার পাইপ টেনে খুলে ফেলা। হাতে যে ইনজেকশানের চ্যানেল করা আছে, বার বার সেটা চ্যানেল খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলা। কতবার চ্যানেল করে দেয়া যায়! ভেন খুঁজে রক্ত নেয়া, সেও তো বেশ কষ্টের ব্যাপার। বাবারও তো খুব লাগে। বলতে বলতে মাথা নিচু করে হালকা গোলাপি ওড়নায় চোখ মুছল রোজি

কই, এত কিছু হয়েছে, আমাকে তো একবার ফোন করে জানাওনি।

করা হয়নি আঙ্কল। তুমি ব্যস্ত লোক।

চল, ভেতরে গিয়ে বসি। এখানে খুব গরম লাগছে। ভেতরের ঘরে গেলে এসিটা চালু করে দেব। তোমাদের আরাম লাগবে। তারপর একটু লস্যি দেব।

ঠিক আছে চল ভেতরে। কিন্তু আমি তোমার কাছে দাদার সমস্ত রিপোর্টগুলো চাইব। অপারেশনের আগে ব্রেনের যে স্ক্যানিং হয়েছিল, তার রিপোর্ট।

কেন বল তো? জানতে চাইল রোজি।

এগুলো আমি একটু দিল্লিতে পাঠাব। আর বোম্বেতে।

কেন?

আসলে তোমার চিকিৎসার লাইন অফ অ্যাকশানটা ঠিক আছে কিনা জানতে।

এই কথা শুনে রোজি মাথা নিচু করল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ দিয়ে দেব।

আজই পাব কি?

হ্যাঁ। আজই দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ঠাকুরপুকুরে যদি দেখতে চায়?

দিন সাতেক লাগবে বড় জোর। আমার পরিচিত এম পি-দের কাউকে দিয়ে তাদের ইনফ্লুয়েন্সে কাজটা করিয়ে দেব। বেশি সময় লাগবে না। আসলে দাদার চিকিৎসা পদ্ধতিটা নিয়ে—টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি বেবি,—অসুখের যে স্টেজ আর যে পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা হচ্ছে, তা নিয়েই ঘোর সংশয় আছে আমার। মনে হচ্ছে, তোমরা যে লাইন ধরে এগোচ্ছ, কার্সিনোমা ঠিক করতে বা অ্যারেস্ট করার ব্যাপারে সেই রাস্তাটা প্রিমিটিভ। এখন লাইন অফ ট্রিটমেন্ট অনেক, অনেক ডেভেলপ করে গেছে। সব কিছুই অন্য ভাবে হচ্ছে। বিশেষ করে বাইরে—মানে দিল্লি, মুম্বাইয়ে। ফলে—আমি দাদার সমস্ত রিপোর্ট একবার এইমস-এ পাঠাব। তুমি আমায় সব গুছিয়ে এক সঙ্গে রেডি করে দাও।

রোজি খুব আলতো করে তার সাজান, সুন্দর শাদা ওপর পাটির কয়েকটি দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর নিচু মাথা আস্তে আস্তে তুলে বলল, বেশ তাই হবে। আমায় দু-চার দিন সময় দাও।

ঠিক আছে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে তুমি আমায় একটা ফোন দিও।

দেয়ালে পুরনো ডিজাইনের কাচ বাঁধান ছবিতে মিথরু, নন বাহিরা ভেরেথরাগানা, এরা হিন্দু পুরাণের ইন্দ্র, দুইভাই অশ্বিনী কুমাররা। আছে অগ্নি দেবতার ছবি। আর আছে সওস্রাবরেজ—হিন্দু পুরাণের কার্তিক। ছবিদের দিকে তাকাতে তাকাতে জামসেদের মনে পড়ল সব পার্শি বাড়িতেই প্রায় এসব দেবতার ছবি।

লস্যির গ্লাস নিয়ে ঢুকল এ বাড়ির কাজের মেয়েটি। সাবেক দিনের কাজ করা সুন্দর কাঠের ট্রের ওপর কাচের গ্লাস। গ্লাসের গায়ে কুয়াশা জমছে।

হাত বাড়িয়ে লস্যির গ্লাস নিলেন জামসেদ। বাবুভাই।

তোমরা নিশ্চয়ই দুজনে দু'জনকে চেন! বাবুভাই মোদির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রোজি।

ও, সার্টেনলি। নিশ্চয়ই। উনি বিখ্যাত অ্যান্টিক কালেকটার, ডিলার—জামসেদ ওয়াদিয়া। বহুবার দেখা হয়েছে ওঁর সঙ্গে আমার। নানা ধরনের পার্টিতে। ক্লাবে। ক্যালকাটা ক্লাব, পাঞ্জাব ক্লাব, টলি ক্লাব। টালিগঞ্জে গলফ খেলতে গিয়েও দেখা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের দেখা হয়েছে পাপেটি-এ। এই তো হয়ে গেল ২৮ অগাস্ট। তাই না! কি, তাইতো মিস্টার ওয়াদিয়া?

ও ইয়েস।

হ্যাঁ, তাইতো। দেখা হয়েছে। মনে পড়ছে।

এবার একটা অন্য কথা বলি। একটু পার্সোনাল। অন্য ভাবে যদি না নেন।

না, না। অন্য ভাবে নেব কেন!

বলুন। বলে জামসেদ মাথার শাদা চুলে আলতো করে আঙুল ছোঁয়ালেন।

আচ্ছা, আপনার স্ত্রী তো আননোন গানমেনদের গুলিতে—আই মিন এক্সপায়ার করেছিলেন। স্পট ডেড। বড় করে খবরটা বেরিয়েছিল কাগজে। তখন পড়েও ছিলাম। প্রপার্টি ইত্যাদি নিয়ে কি সব কি সব ঝামেলা। রিয়াল এস্টেট-এর ব্যাপার নিয়েই গণ্ডগোল। তখন পড়েছিলাম। পর পর কয়েকদিন বেরিয়েছিল কাগজে। ফলো আপ স্টোরিও। কিন্তু তারপর কি হলো! পুরো চাপা পড়ে গেল কেসটা! হাত গুটিয়ে নিল পুলিশ?

পুলিশ হাত গুটিয়ে নিয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু ক্রিমিনালরা কেউ ধরা পড়েনি। অ্যারেস্ট হয়েছে বলে আমি অন্তত জানি না।

মানে?

মানে আর কি! সেরকম কোনো রিপোর্ট আমার কাছে নেই।

ওঃ! বলেই মুখ দিয়ে আক্ষেপের একটা শব্দ—চুক চুক করতে করতে বাবুভাই ঠাণ্ডা লস্যির গ্লাস তুলি ঠোঁটে ছোঁয়াল। আলতো একটা চুমুক দিয়ে সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। তারপর বলল, ভেরি স্যাড।

বাবুভাইয়ের দেখাদেখিই যেন লস্যির গ্লাস হাতে তুলে নিলেন জামসেদ। তারপর একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে ভেতরটা জুড়িয়ে দিতে চাইলেন।

পরের চুমুকটা খুব দ্রুত দিতে চাইল বাবুভাই। তারপর লস্যি শেষ করে রুমালে মুখ মুছে রোজির দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে ঐ কথাই রইল। তুমি আমায় একটা ফোন দেবে। আমি এসে মেটিরিয়ালগুলো কালেকট করে নিয়ে যাব। আর অবশ্যই দাদা কেমন থাকে, আমায় জানাবে। আচ্ছা, মিস্টার ওয়াদিয়া—আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। ওকে, বাই। সি ইউ।

সি ইউ এগেইন। বলে সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত নাড়লেন জামসেদ।

রোজি তার ওড়না ঠিকঠাক করতে করতে চন্দনের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আমি ফোন করব আঙ্কল। অবশ্যই ফোন করব।

করবে। নিশ্চয়ই করবে। সে কথা তো হয়েই গেল তোমার সঙ্গে। আরও একটা ব্যাপার, এর মধ্যে দাদাকে একদিন দেখতে যাব। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। খুব খারাপ লাগে। অথচ এত প্রেসারে থাকি। কাজ আর শেষ হয় না যেন। খালি কাজ কাজ আর কাজ। মামলা। ব্রিফ। ক্রস এগজামিনেশন, আরগুমেন্ট, জাজমেন্ট। জাজমেন্টের পর আবার আপিল। হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, ল পয়েন্ট। আইনের নানা গলি-ঘুঁজি—এই করতে করতেই গোটা জীবন কেটে গেল প্রায়। আর পারা যায় না। মাঝে মাঝে এত টায়ার্ড লাগে।

ব্যাচেলাররা আবার টায়ার্ড হয় নাকি! তারা তো সব সময়ই আরবি ঘোড়া। এতক্ষণ বাদে কথা বললেন জামসেদ।

হয় হয়—বলে চোখের ইশারায় মুখে অন্য রকম একটা হাসি টেনে এনে বাবুভাই বলল, শরীরের ধর্ম যাবে কোথায়! বয়েস—বয়েস কাবু করে সবাইকে। একেবারে পেড়ে ফেলে। ঠিক আছে আজ উঠি। অনেকক্ষণ বকবক হলো।

বাবুভাই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সাজান দাঁতে শব্দ না করে সুন্দর হাসল রোজি। তারপর খুব চাপা গলায় বলল, বাবাঃ! বাঁচলুম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যাকে বলে। ভাগ্যিস তুমি ছিলে আঙ্কল, তাই আমায় সেভাবে রগড়াতে পারেনি। যদি একবার একা পেত আমায়, তা হলে দেখতে।

তাই কি!

জামসেদের গলায় সামান্য সংশয়।

তুমি জানো না আঙ্কল কি সাংঘাতিতক ইগো আমার এই ব্যারিস্টার আঙ্কলের। কাউকে মানে না। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ধরাকে সরা জ্ঞান করে একেবারে। এত ইগো এত ইগো যে— বাবার কাছে শুনেছি, যে মেয়েটিকে বিয়ে করার কথা ছিল, তাকে নিয়ে রেজিস্ট্রি করতে গিয়ে ফিরে আসে রেজিস্ট্রি না করে।

সে কি! ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে! জামসেদের গলায় বিস্ময়।

হ্যাঁ, রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল বিয়ে না করে। তারপর আর বিয়েই করল না।

এরকম একটা কথা বহুদিন আগে শুনেছিলাম বোধ হয়।

শুনে থাকবে। আমাদের পার্শি কমিউনিটি তো খুব বড় নয়—সবার সঙ্গে সবার দেখা হয়।

নাঃ! এবার উঠব বেবি।

এখনই চলে যাবে আঙ্কল?

হ্যাঁ, এবার যাব। অনেকটা যেতে হবে।

ঠিক আছে। তা-লে এস আবার একদিন।

আসব বেবি।

রোজি জিজিবয়দের ফ্ল্যাট থেকে নামতে কেন জানি না বাবুভাইয়ের পালিশ করা খুব চকচকে কালো দামী শু্য জোড়া চোখের সামনে ভেসে উঠল জামসেদের। টক টক টক করে কি অসাধারণ ভাবে স্মার্টলি হেঁটে যাচ্ছে বাবুভাই। তার চলায় এক ধরনের বুনো ঘোড়ার তেজ। চলে যাওয়ার পরও সেই তেজের খানিকটা যেন জড়িয়ে থাকে চারপাশের বাতাসে।

নিচে নেমে অন্ধকারে গাছ-গাছালিদের দেখতে পেলেন জামসেদ। উঠোনের আলো জ্বলে উঠল চট করে। আলোয় অন্ধকার তেমন করে কাটে না। বরং খানিকটা ছাপকা ছাপকা হয়ে এখানে-ওখানে ফুটে থাকে। একশো পাওয়ারের বালব আর কতদূরই বা আলো পৌঁছে দিতে পারে?

নিজের ফিয়াট-এর দরজা খুলে বাইরে একবার ঝুঁকলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। রোজি তখনও দাঁড়িয়ে। হাত নাড়ল। ইস, এরকম মেয়ে তো আমারও থাকতে পারত একটা। এমন চনমনে ফুটফুটে। কাজের। নানাভাইয়ের এত বড় অসুখ। কিন্তু মেয়েরাই তো আগলাচ্ছে বুক দিয়ে। বাবাকে সব সময় আগলে আগলে রাখছে—মেয়েরা, জামাইরা। দেখলেও ভালো লাগে। রোজির ছেলেটা কনভেন্টে পড়ে—দেরাদুনে। ছুটিতে আসে। এ সবই নানাভাইয়ের কাছে শোনা। ছেলে তো আমারও ছিল। দু-দুটো। কিন্তু একটাও রইল না।

রোজি আবারও হাত নাড়ল।

নিজের গাড়ির দরজা বেশ জোরে বন্ধ করে হাত নেড়ে দিলেন জামসেদ।

এতক্ষণ বাড়ির কোলাপসবল গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল রোজি। এবার আমার পেছনে পেছনে লন পেরিয়ে এসে সদর দরজায় কোলাপসবলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে ভাবতে জামসেদ আবার একবার খুলে বন্ধ করলেন গাড়ির দরজা।

চার

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের কেবিনে কেবিনে রাত নেমে এলেই আরও বেশি মন খারাপ হয়ে যায় নানাভাই মোদির। সকালের দিকটা বড্ড ঘুম পায়। ঘুম। খালি ঘুম। চোখ খুলতেই ইচ্ছে করে না। কেমন যেন আঠা আঠা ঘুম জড়িয়ে থাকে দু-চোখে। ইচ্ছে করে না চোখ খুলতে। শুধু বড় বড় হাই ওঠে।

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে এই কেবিনের ভেতর টিউব আলোর ধাক্কায় অন্ধকার বাইরে চলে গেছে। চোখ বুজে বুজে নানাভাই মোদি অন্য দিনের মতোই আজও কাঠের তৈরি সেই প্রাচীন সব নৌকোর সার দেখতে পাচ্ছিল। হরমুজ বন্দর থেকে জলে ভাসা ঐ সব নৌকোরা দল বেঁধে এগিয়ে আসছে ভারতের দিকে। হাওয়ায় আঁশটানি নোনা গন্ধ। পথ আর যেন ফুরোয় না।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস সমুদ্র ভেঙে ভেঙে এগোন। পেছনে পড়ে আছে কোহিস্তানের পাহাড়, অন্ধকার গুহা। সেখানে ৬৪১ থেকে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত—এই ১২৫ বছরের জনপদ-স্মৃতি। আরও কত কি! সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ভেঙে ভেঙে সেই সব নৌকোরা এগোচ্ছে। এগোচ্ছে। সাগরের বুক থেকে উঠে আসা নোনা জলের ছিটে মাঝে মাঝে উঠে আসছে নৌকোর পাটাতনে। দিনের বেলা সূর্য আর রাতে আকাশের গায়ে জেগে থাকা তারা—বিশেষ করে ধ্রুবতারাকে দেখে দেখে সামনে এগোন। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

কোহিস্তানের পাহাড়ে, পাহাড়ের গুহায় অন্ধকারে পড়ে রইল কত কত স্মৃতি। কত বছরের সংসার। ঘর-গেরস্থালি। ভাবতে ভাবতে ক্যানসার হাসপাতালে কেবিনের ভেতর লোহার খাটে শোয়া নানাভাই পাশ ফিরল। রোজি বারবার নার্সকে বলে গেছে

ঠিকঠাক করে কোমরে, পাছায়, পায়ে ঘষা না লাগিয়ে পাশ ফিরিয়ে দিতে। ঘষা লাগলে, ছড়ে গেলে, ছাল উঠলে বেডসোর অবধারিত। একা একাই পাশ ফিরলাম কি, নাকি নার্সই ফিরিয়ে দিল? সব ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারি না। নানাভাই মোদি যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল।

পাশ ফেরা অবস্থায় খানিকটা জাগা না-জাগার ভেতর নানাভাই সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে আসা প্রাচীন নৌকোদের দেখতে পেল। যাদের পালে নোনা হাওয়ায় খোঁচা, দাঁড়ে নোনতা জলের কামড়। পথ আর যেন ফুরোয় না। কেবিনের মাথার দিকে বড় জানলাটা এখনও খোলা। সেই জানলার বাইরে খানিকটা এবড়োখেবড়ো জমি। ইট। উঁচু নিচু মাটি। সেখানে ঝুরি ছড়ান বিশাল বট গাছের গুঁড়ির কাছাকাছি নৌকোগুলো পর পর পর পর এসে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

বহরের প্রথম নৌকোটিকে সেই বট গাছের সঙ্গে মোটা কাছি দিয়ে যে লোকটি বেঁধে ফেলল তার গাল ভর্তি কালো দাড়ি। মাথায় শাদা পাগড়ি। বড় বড় চোখ। তীক্ষ্ণ নাক। ছুঁচলো নাকের ডগায় কেবিনের টিউব-আলো চলকে গিয়ে পৌঁছেছে।

সেই নাক দেখতে দেখতে নিজের নাকে হাত দিল নানাভাই। নাহ, অত ছুঁচলো নয় ডগা। কিন্তু ভোঁতা বলা যাবে না।

স্বপ্ন, নাকি ঘোরের ভেতর সেই কাঠের প্রাচীন নৌকোর ভেতর সাজান কমপিউটার দেখতে পেল নানাভাই। কমপিউটারের কি বোর্ড, মাউস টিপতে টিপতে সেই কমপিউটার স্ক্রিনে পুরাকালের নৌকোদের ছবি তৈরি করতে লাগল নানাভাই নিজে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, যতবার মাউস ক্লিক করতে যায়, ততবারই কমপিউটার-পরদায় শেয়ার বাজারের হিসেব-নিকেশ, জটিল সব অঙ্ক ফুটে উঠছে। সেনসেক্স। আর জেগে উঠছে টাকা ডলার পাউন্ড ইউরোর বিনিময় মূল্য। সোনা-রুপোর বাজার দর।

কিছুতেই কোহিস্তানের পাহাড় আর গোপন গুহা থেকে পালিয়ে আসা মানুষদের পুরনো সেই সব নৌকোর ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারছে না নানাভাই।

আকাশে অদ্ভুত এক ফালি রহস্যময় চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় চারপাশ থই থই। ভেসে যাচ্ছে। মহাবৃক্ষ —বটগাছটিও জ্যোৎস্নায় চান সেরে নিতে নিতে ফিক ফিক হাসছে। অনেক অনেক মাস, দিন ধরে সাগর ভেঙে ভেঙে এগিয়ে আসা নৌকোদের কাঠ ভেজা কাঠ ভেজা গন্ধ মাথার ভেতর ঢুকে পড়ে সব কেমন যেন ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। নোনা জলে দীর্ঘ দিন ধরে ভিজে ওঠা কাঠের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে কেবিনের হাওয়ায়।

অনেক অনেক টাকার দরকার আমার এই চিকিৎসার জন্যে। যেমন আসুরিক অসুখ, তেমনই তার আসুরিক চিকিৎসা। জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। কি করে একা একা সামলাবে রোজি, নওরোজিরা! কি ভাবে যোগাড় করবে এত টাকা? বিছানায়

শুয়ে শুয়েই হাওয়ায় আঙুল ভাসিয়ে ভাসিয়ে মাউস টিপছে নানাভাই। তার মনে হচ্ছে বট গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা সেই সব নৌকোর মধ্যে সবার সামনেরটিতে বসে বসে সমুদ্র জলে ভিজে ওঠা কাঠের গন্ধ নাক দিয়ে টানতে টানতে কমপিউটারের মাউস টিপে যাচ্ছে। পরদায় কতরকম কারিকুরি। রঙ। ছবি। ফিগার। টাকার হিসেবের জটিল অঙ্ক। নানারকম শেয়ারের দাম। হিন্দুস্থান লিভার, আই টি সি, রিলায়েন্স, টাটা টি। কোনটা, কোনটা ধরব এখন? কোনটা ধরে এগোব? কোনটা ধরে কোনটা ছাড়লে অনেক টাকা আসবে? যে টাকা রোজি-নওরোজিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। বহু টাকা দরকার ওদের।

কতদিন রোজি-নওরোজিদের কিছু কিনে দিতে পারি না। নাতি-নাতনি, জামাইদেরও কিছু দেয়া হয় না। এভাবে হয় নাকি! শুধু বিছানায় শুয়ে থাকা। আর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা! আমি কি পারব, আবার পেয়ে যাব ঠিক মতো হাতে-পায়ে জোর! করতে পারব কলকাতা-মুম্বাই? ভাবতে ভাবতে 'ও বাবা—বাবা—বাবা গো—' অভ্যাস মতো বলে উঠল নানাভাই।

বাইরে আকাশে তেমন মেঘ নেই। সেই অনেক অনেক তারা ফোটা আকাশের দিকে তাকিয়ে গাছে নৌকো বাঁধা মানুষদের মধ্যে প্রধান মানুষটি বলে উঠল, রাত্রি তিন প্রহরে নৌকো ছাড়ব। আরও অনেক অনেক দূরে যেতে হবে আমাদের।

খাটে শোয়া নানাভাই ততক্ষণে আবারও পৌঁছে গেছে সেই নৌকোটির খোলের ভেতর। যেখানে ছড়ান কমপিউটার। তার স্ক্রিনে স্ক্রিনে জটিল জটিল সব হিসেব নানান তথ্য। একা একা মাউস টিপে পরদায় কি কি যেন তুলে আনতে চাইল নানাভাই

যা চাইছি, কিছুতেই আসছে না। নিজের মনে মনে বিড় বিড় করল নানাভাই।

চাঁদের চোরা আলো কাপড়ের শাদা পাল চুঁইয়ে নেমে আসছে খোলের ভেতর সেই চাঁদের আলোয় অদ্ভুত একটা ঝিমঝিমে ভাব আছে। সেই নেশায় বুঁদ হতে হতে চাঁদ মাখা পালের দিকে তাকাল নানাভাই। শাদা পাল সমুদ্রের জলে-রোদে নুন মাখ বাতাসে অনেকটা হলদেটে। তারপর গুটিয়ে রাখার ফলে তাকে বিশাল একট সিন্ধুশকুন মনে হচ্ছে এখন। অথচ খুলে দিলেই ফুলে ফেঁপে উঠবে অনুকূল বাতাসে হাওয়ার টানে তরতর তরতর করে এগিয়ে চলবে নৌকো। এক সঙ্গে অনেকগুলো দাঁড় দু'পাশে পড়বে—জলের বুকে। ছপ ছপ। ছপ ছপ। জল কেটে কেটে এগোবে নৌকো

নৌকোর খোলে বসে কমপিউটারের মাউস টিপতেই আকাশের নক্ষত্র, চাঁদ তাদের আলো অন্ধকার সমেত ঢুকে পড়ল পরদায়। সেই পরদার ওপর তখন নক্ষত্রবাহার চন্দ্রশোভা। তারপর মাউস টিপতেই চাঁদ, তারারা মুছে গিয়ে অঙ্কের হিসেব। জটিল জটিল সব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। আই টি সি, হিন্দুস্থান লিভার, টাটা টি, টাটা স্টিল রিলায়েন্স। নোনা জলে ভেজা কাঠের গন্ধ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে জলের কল্লোল ফুটে উঠল শব্দ হয়ে। জলের শব্দ—ছলাৎ ছলাৎ। জানলার কাছে। মাথার দিকে খোলা জানলার ধারে।

এ আমি কোথায়! কোথায় আছি? নৌকোর খোলের ভেতর, নাকি হাসপাতালের কেবিনে লোহার খাটে? কিছুই ঠিক করে বুঝে উঠতে পারল না নানাভাই মোদি। জলের গর্জন বেড়ে উঠছে। তার চাপে কাঁপছে জানলার পাল্লা। কেবিনের দেয়াল।

জল ছুটে আসছে খুব জোরে। আরও জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। সেই ঠেলাঠেলিতে কেঁপে উঠছে কেবিনের জানলা, দেয়াল। থর থর করে কাঁপছে। জলের নোনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

সেই দড়িঅলা, মাথায় শাদা পাগড়ি একটু একটু করে বেড়ে ওঠা জলের দিকে একবার তাকিয়ে আবার নজর করল আকাশের দিকে। চেয়ে দেখল চাঁদ, তারাদের।

জলের টানে দুলে উঠছে নৌকোরা। নিজের হাতে বট গাছের গা থেকে দড়ি খুলে দিল সেই দাড়িঅলা শাদা পাগড়ি মাথায় মানুষটি। নৌকো এবার ভেসে যাবে অকূল দরিয়ায়।

অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে দিল মাল্লারা। বাতাস পেয়ে বড় একটা ময়ূরপেখম হয়ে যেন ফুলে উঠল শাদা থেকে অল্প হলদে হয়ে ওঠা পাল। কিন্তু জ্যোৎস্নায় সব ভেসে গেল। বোঝা গেল না তার ময়লা ধরা শাদা রঙ। মনে হলো আকাশের চাঁদই বুঝি নৌকোদের মাথায় পাল হয়ে ফুলে উঠল।

নৌকোর খোলের ভেতর বসে কমপিউটার চালান নানাভাই, জলের শব্দ, নৌকোদের দুলে ওঠা, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ডানা মেলা পাল দেখতে দেখতে কেবিনের খাটে ফিরতে চাইল। আবার কেবিনের খাটে শুয়ে থাকা নানাভাই ভেসে যেতে চাইল এই নৌকোর সঙ্গে।

ক্যানসার হাসপাতালের কেবিনের খাটে শোয়া নানাভাই চিৎকার করে উঠল—'ও বাবা! বাবা গো! ও বাবা—'

সাগর জলে ভেসে যাওয়া নৌকোর খোলের ভেতর বসে কমপিউটার চালান নানাভাইও একই সময়, একই সুরে চিৎকার করে উঠল—'ও বাবা! বাবা গো! ও বাবা—'

তারপর একসময় কেবিনের খাটে শুয়ে থাকা নানাভাই দেখতে পেল সেই পাল তোলা নৌকোরা চাঁদের আলো মেখে আস্তে আস্তে একটু একটু করে চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে। চাঁদের আলো মেখে সেই বহরকে দূরে সরে যেতে দেখে নিশ্চিন্তে চোখ বুজল নানাভাই।

ঠিক তখনই নিজের বিছানায় শুয়ে অনেক রাতের মতোই ছটফট করছেন জামসেদজি। কোনো কোনো রাতে শোয়ার ঘরটা তাঁর কাছে ক্রমশ ছোট হয়ে ওঠে। ঘরে দেয়ালগুলো বুঝি সরে সরে আসে কাছে। মাথার ওপরের ছাদটাও নেমে আসে অনেক অনেক নিচে। মনে হয় চাপা পড়ে এখনই মারা পড়ব। দম বেরিয়ে যাবে।

ঘরটা এভাবে ছোট হয়ে আসে বহু রাতেই। তখন ঘুম আসে না। বারবার উঠে জল

খেতে হয়। বাথরুম। আবার শুয়ে শুয়ে প্রতীক্ষা করা ঘুমের জন্যে। কিন্তু সে আসে কই!

এই ঘর ছোট হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা শুরু বছর পনের আগে।

জামসেদের মনে পড়ল বাবার একটা বসার চেয়ার-টেবিল ছিল। সেখানে বসে বসে বাবা কাজ করতেন। এরুচশার হঠাৎ খেয়াল হলো ঘরটা রি মডেলিং করবে। রি মডেলিং মানে এখানকার ফার্নিচার ওখানে। ওখানকারটা এদিকে। এ সব করতে গিয়ে বাবার চেয়ার-টেবিলটা তিন তলায় পাঠাতে চাইল এরুচশা। তার আগে একবার জিগ্যেস করেছিল আমার। আমি বললাম, না। বাবার টেবিল-চেয়ার যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে।

কথাটা পছন্দ হলো না এরুচশার। বুঝতে পারলাম। গুম মেরে রইল। সেদিন পার্ক স্ট্রিটে একটা অকশন ছিল। বাবার টেবিল-চেয়ার যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে বলে আমি পার্ক স্ট্রিটের অকশনে বিড করতে চলে গেলাম। সেদিন অকশন হলো না। জিনিসপত্র সেভাবে যোগাড় করতে পারিনি। অথচ ভালো ভালো জিনিস ছিল। প্রাচীন ঘড়ির খোঁজে ওখানে গেছিল মনীশ সরকার। আমার পুরনো বন্ধু। মনীশেরও সেদিন প্রায় কিছুই হয়নি।

অকশন থেকে বেরিয়ে ব্যাপক মন খারাপ নিয়ে দুজনে মিলে পার্ক স্ট্রিটের একটা বারে গিয়ে বসলাম। এমনই গরমের দিন সেটা। ভ্যাপসা গরম। এসিতে বসলে খানিকটা আরাম লাগবে। গরমও কিছুটা কাটবে —এমন একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমরা বারে ঢুকলাম। তখন একটা বেজে গেছে। মনীশ বিয়ার নিল। চিলড বিয়ার খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করবে। মনটাও নাকি ফ্রেশ হবে এতে। নিজের শোয়ার ঘরের খাটে শুয়ে শুয়ে এসব মনে পড়ে যাচ্ছে জামসেদ ওয়াদিয়ার।

রাত কত হলো?

এ বাড়িতে দশ-বারোটা পুরনো দেয়াল ঘড়ি আছে। এক একটা এক এক রকম সময় দেয়। কারোরই সময় দেয়ার ব্যাপারটা ঠিকঠাক নয়। প্রায় সব সময়ই ঘড়ি বাজছে। ঘড়িদের ঘণ্টা নানারকম শব্দ করে জানিয়ে যাচ্ছে সময়। কিন্তু তা দিয়ে কাজ চলে না।

মাথার চ্যাপটা, নিচু বালিশের নিচে লোডেড কোল্ট। তিন সেলের টর্চ। দু'সেলের টর্চ। একটা যদি না জ্বলে— তাই এই সতর্কতা। আর একটা ব্যবহার করতে পারব সঙ্গে সঙ্গে। এছাড়া আট ইঞ্চি একটা ড্যাগার আছে। আর আছে কালো চামড়ার ব্যান্ডে বাঁধা কেমি। টর্চের আলো না ফেলেই তার ফসফরাস মাখা কাঁটা দেখে সময় বুঝতে পারি. ঘড়িতে দুটো এখন। ঠিক দশ পনের মিনিটের মধ্যে সবগুলো দেয়াল ঘড়িতে দুটোর ঘণ্টা বেজেছে। হাত ঘড়িতে দুটো বেজেছে। তার মানে এখনও প্রায় তিন ঘণ্টা ফর্সা হতে।

ঘুম আসে না কিছুতেই। না ঘুমিয়েই কেটে যেতে থাকে রাতের পর রাত। কষ্ট বাড়ে। ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসা দেয়ালদের কথা কাউকে বলতে পারি না। ঝুলে ঝুলে

নামা সিলিংয়ের কাহিনীও বলা যায় না। অথচ শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। ঘুম হয় না। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠি। মনটা ভয়ানক ভারী থাকে।

এভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর বাধ্য হয়ে কাউনসেলিং করাই। দিনের পর দিন যেতে হয় মনোবিদের কাছে। ওযুধ, কাউনসেলিং। সে একটা পর্ব যায়। কিন্তু তারপর থেকেই কোনো কোনো রাতে ভয়ানক ভয় চেপে বসে একা বিছানায়। দেয়ালরা ক্রমেই গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসতে চায়। ছাদ একটু একটু করে নামতে থাকে নিচের দিকে। দম বন্ধ রাত কাটে না ঘুমিয়ে। এমন কখনও কখনও হয়। আজও জামসেদ ওয়াদিয়াকে তার শোয়ার ঘরের দেয়ালরা চেপে ধরতে চাইছে। ছাদও নামছে ওপর থেকে।

কাউনসেলিং কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছিলেন, একটা মাইল্ড ডোজের ঘুমের ওষুধ খেয়ে রেগুলার শুতে। কিন্তু স্লিপিং পিলের ফাঁদে পড়তে রাজি হইনি। ফলে বন্ধ করে দিয়েছি ঘুমের বড়ি—জামসেদের মনে পড়ল। ঘুম আসার ট্যাবলেট খেয়ে একবার ঘুমনো শুরু করলে তারপর তো আর তার কোনো শেষ নেই। খেয়ে যেতেই হবে। যেতেই হবে। যেতেই হবে।

মাথার নিচের খুব চ্যাপটা বালিশ উল্টে দিলেন জামসেদ। তারপর সাবধানে মশারি সরিয়ে উঠে জল খেলেন কাচের কুজো থেকে গড়িয়ে। রঙিন কাচের এই কুজো বহু দিনের। এরপর লাইট জ্বেলে দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে খোলা বারান্দায় গিয়ে একবার দাঁড়ানোর কথা ভেবে কি মনে হতে সিদ্ধান্ত বদল করে ফিলে এলেন। ঘর লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে বেসিনের কল খুলে জল দিলেন ঘাড়ে। চোখে মুখে। কানের পিঠে। ঠাণ্ডা জলে বেশ খানিকটা আরাম, সুস্থতা তৈরি হলো। তারপর পেচ্ছাপ করে ফিরে এসে বিছানায় বসলেন। এখন রাত প্রায় তিনটে।

বিছানার পাশে রাখা 'কেমি'-তে সময় দেখে চুপচাপ ছাদের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। একটু বাদেই ওয়াদিয়া ম্যানসন-এ বছরের পর বছর পুষে রাখা পুরনো পুরনো দেয়ালঘড়িরা নিজেদের মতো ঢং ঢং ঢং করে সময়ের ঘণ্টা বাজাতে থাকবে। পর পর বেজে ওঠা এই ঘণ্টাধ্বনি অসহ্য মনে হবে কানে। কিন্তু কিছু করার নেই। এসব ভাবতে ভাবতেই জামসেদ বড় করে হাই তুললেন। একবার। দু'বার। তারপর দেখতে পেলেন তাঁর বড় ছেলে জাহাঙ্গীর ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে।

জাহাঙ্গীর তো মাঝে মাঝেই আসে।

বহু বছর আগে অ্যাকসিডেন্টে মৃত ছেলের দিকে তাকালেন জামসেদ।

কিছু বলবে?

বলব বলেই তো এসেছি।

বেশ তো বল।

চারপাশে আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। অনেক অনেক বছর হয়ে গেল নেই জাহাঙ্গীর। কিন্তু তার সঙ্গে আমার দেখা হয় এমনই কোনো ঘোর নিশীথে। যখন এই

ঘরের দেয়াল. ছাদ একটু একটু করে পিষে মারতে চায় আমায়। ছাদ নেমে আসতে চায় মাথার ওপর। তখন-তখনই আমার মৃত জ্যেষ্ঠ পুত্র এসে হাজির হয় এই ঘরে। তারপর সে একটু একটু করে শোনাতে থাকে ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে হরমুজ বন্দর থেকে উত্তাল সাগর পেরিয়ে যাত্রার কথা। কাঠের সাবেক নৌকোয় উত্তাল সাগরের ঢেউ ভাঙা। নোনা জল পেরন। সকলের গায়েই সমুদ্রের গন্ধ। তার আগে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আরবদের ঐর্যানাম দখল করে নেয়া। পালিয়ে গিয়ে অগ্নি-উপাসকরা থাকছে কোহিস্তানের দুর্গম পাহাড়ের আড়ালে। অন্ধকার গুহার ভেতর।

সে কোহিস্তান কেমন জাহাঙ্গীর?

এ প্রশ্ন করলে জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর দেয় না। বরং সে বলে যেতে থাকে ৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের উপকূলে পৌঁছনোর কাহিনী।

পলাতক প্রাচীন অগ্নি-উপাসকদের জন্য জমি দিলেন রানা জয়দেব।

জানি জাহাঙ্গীর। সে কথা লেখা আছে 'কিস্যে-ই-সনজান' নামের বইয়ে। 'কিস্যে-ই-সনজান'-এ রানা জয়দেবের নাম অমর করে রাখার চেষ্টা আছে।

এ পৃথিবীতে কিছুই অমর নয় বাবা। আমরা কেউ চিরজীবী নই।

তবু তো ভালো কাজ, ভালো কথা, ভালোবাসা অনেক অনেক দিন থেকে যায়। চট করে পুরনো হয় না। তাকেই আমরা চলতি কথায় বলি, অমর হওয়া। তাই কি না?

হয়ত তাই। তারপর যা বলছি শোন। রানা জয়দেব তো ঐর্যানাম থেকে আরব আক্রমণে উৎখাত হয়ে আসা পার্শিদের জমি দিলেন। কিন্তু তাঁর একটা শর্ত ছিল। সেই শর্ত হলো—তোমাকে আগেও বলেছি, তবু আবারও বলি, পার্শিরা বহন করতে পারবেন না কোনো অস্ত্রশস্ত্র। আর তাঁরা মেনে চলবেন গুজরাটের সমস্ত লোকাচার।

নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠল রানা জয়দেবের রাজত্বে। নিজেদের পবিত্র অগ্নি পুজো করার অধিকার পেলেন পার্শিরা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এই জায়গায় নাম হলো হন্‌জমন। হন্‌জমন মানে মিলিত হওয়ার জায়গা। সংস্কৃত তাকে বলে সংগমন। আধুনিক ফারসিতে অনজুমান।

জাহাঙ্গীরের কথা শুনতে শুনতে হাই উঠল জামসেদের। হাই তো একটা ওঠে না। পর পর আসে। একটা, তারপর আর একটা। চলতেই থাকে। বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাই চাপা দিয়ে জামসেদ তাকিয়ে থাকেন এই ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর মৃত পুত্রের দিকে। বড় সন্তান। তাকে আর ছোঁয়া যাবে না। ভাবলেই বুকে বড় লাগে। আচ্ছা, এমন যদি হত—বছরের কোনো একটা দিনে আমরা যদি দেখতে পেতাম, কথা বলতে পারতাম আমাদের মারা যাওয়া প্রিয়জনদের সঙ্গে। বাবা, মা, দাদামশাই, দাদামশাইয়ের বাবা, তাঁর বাবা, তাঁরও বাবা—কিংবা ঠাকুরদা, বুড়ো ঠাকুরদা, তস্য বুড়ো ঠাকুরদা—তস্য তস্য তস্য—এভাবে যদি অনেক অনেক পুরুষ আগের মানুষের সঙ্গে কথা হ'ত। একটি দিনে—ব্যস, বছরে একটাই দিন। তাঁদের যদি দেখতাম। ভাবতে ভাবতে চোখ জলে ভরে গেল জামসেদের।

ডান হাতের উল্টো পিঠে ঝাপসা হয়ে আসা দু'চোখ মুছে আবারও নিজের শোয়ার ঘরে দাঁড়ান বড় ছেলে জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়ার আবছা মেঘ মেঘ শরীর দেখতে পেলেন জামসেদ। এই আছে, এই নেই—এমন একটা ভাব। ধরা-ছোঁয়া যায় না। কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যায় চেহারার। আমারই মতো লম্বা। কিন্তু ধোঁয়া ধোঁয়া সেই শরীরকে কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরা, আদর করার কোনো উপায় নেই। ভাবলে কষ্ট হয়। ব্যথা বাড়ে। বুকের ভেতর চিনচিনে একটা যন্ত্রণা।

জাহাঙ্গীর বলে উঠল, সমুদ্রের তীরে সনজান নামে সেই জায়গা আজও রয়ে গেছে।

জাহাঙ্গীরের বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জামসেদ দেখতে পেলেন সমুদ্রের নোনা জল আছড়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ বালিভূমির ওপর। সোনালী সোনালী বালির ওপর উপচে ওঠা শাদা শাদা ফেনা। আদিগন্ত লবণাম্বুরাশির ওপর দিগন্ত ছোঁয়া আকাশে উড়ছে সিন্ধুসারসেরা। ঢেউ ভাঙার গর্জন ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ গলায় ককিয়ে উঠছে সেই সব সিন্ধুসারস। তাদের সেই কান্নায় আরও বুঝি উতরোল হয়ে উঠছে সমুদ্র। সেই নীল, কিংবা ঠিক নীল নয়, সবুজাভ-নীলে দুপুরের সূর্য তার রঙ মিশিয়ে দিয়েছে। সেই উর্মিমালার নামা-ওঠায় জীবনের স্পন্দন বুঝি ফুটে ওঠে।

অনেক অনেক নটিক্যাল মাইল দূর থেকে দীর্ঘ সমুদ্র পথ পেরিয়ে আসা নৌকোরা সারি বেঁধে স্থির। তার ওপর আকাশের আলো। একটি দুটি সিন্ধুসারস এসে বসে সেই পাল গোটান নৌকোর ওপর। তারপর বুক ভাঙা ডাক ডেকে উড়ে যায় অনেক, অনেক দূরে। তাদের সেই হৃদয় খোবলান হাহাকার সমুদ্র-তরঙ্গে মেশে। তারপর এক সময় তাদের ডাক আর সমুদ্রের স্বর এক হয়ে যায়।

সমুদ্রের ধারে সনজান গড়ে উঠল। আর অগ্নি দেবতার মন্দিরও তৈরি হলো। তার নাম ইরান-শাহ। সেটা ৭৯০ খ্রিস্টাব্দ। এটাই ভারতের প্রথম অগ্নিদেবের মন্দির। তারপর উদবাড়াতে সরে এল ইরান-শাহ।

জাহাঙ্গীরের এসব কথা শুনতে শুনতে জামসেদের মনে পড়ল কলকাতার মেটকাফ স্ট্রিটে, লালবাজারের কাছাকাছি হলুদ রঙের অগ্নি মন্দিরটির কথা। বহু বছর সে মন্দির বন্ধ। কিন্তু আমরা ছোটবেলায় দেখেছি সেই মন্দিরের দোতলার দেয়ালে আছে আলিমায়া—পবিত্র অগ্নি। মশাল হয়ে জ্বলছে সেই আগুন শিখা। জ্বলছে। দিনে রাতে তার কোনো বিশ্রাম নেই। চব্বিশ ঘণ্টা ধরেই জ্বলে। একতলায় আর ফটকের দিকে আছে জরথুশত্রর মূর্তি। ডান হাতের তর্জনীটি তোলা আকাশের দিকে। বাঁ হাতে দণ্ড। মাথায় পাগড়ি।

অগ্নি উপাসক পার্শি ছাড়া সেই মন্দিরে কারও ঢোকার অনুমতি নেই। মেটকাফ স্ট্রিটের হলুদ দেয়ালঅলা অগ্নি দেবতার মন্দিরের গায়ে সূর্যের আলো পড়লে একদম

অন্যরকম লাগে। দিনের প্রহর বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার রঙও কি যায় বদলে? আর‍ং
একটা পার্শি মন্দির আছে কলকাতায়। এজরা স্ট্রিটে। বিছানায় বসে বসে সব পর প
মনে পড়ে যাচ্ছে জামসেদের। আমরা কি জিপসিদের মতো সূর্য ওঠার দেশের দিকে
রওনা হয়েছিলাম, সেই কোহিস্তানের পাহাড়-গুহা থেকে ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে। আর ঘরে
ফিরলাম না আমরা? নাকি ফিরতে পারলাম না! সবাই তো ফিরে গেল নিজের নিজে
বাসভূমিতে। মাতৃভূমিতে—দেশে। ইহুদিরা গেল। আর্মানিরাও। শু
আমরা—পার্শিরাই পারলাম না। কেন পারলাম না? কোন জড়তা কাজ করল এ
পেছনে? থেকে গেলাম ভারতে। এই দেশ হয়ে গেল নিজেদের বাসভূমি। গুজরাটি
শিখে নিলাম। পাশাপাশি হিন্দি, ইংরেজি। জড়িয়ে গেলাম ভারতীয় জীবনের সঙ্গে
একটু একটু করে ভাষাটা সরে যাচ্ছে স্মৃতি থেকে। শুধু ধর্মীয় আচার আর বিয়ে
থা—এটুকুতেই যা নিয়ম মানামানি, কড়াকড়ি।

জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়া এখনও দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর। তাকে টাওয়ার অব সাইলেন্স-এ
রেখে এসেছিলাম আমরা সবাই গিয়ে। অ্যাকসিডেন্টের পর মুখটা ভালো করে চেনা
যাচ্ছিল না। নিজের সন্তানকে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে সেই মৃতদের পুরীতে রেখে
আসা—ভাবতে ভাবতে আবারও চোখে জল এল জামসেদের।

জাহাঙ্গীর তার মেঘ মেঘ শরীরটি নিয়ে বেশ আস্তে আস্তে বলে যাচ্ছে—
উদাবাড়ার ইরান-শাহ নামের অগ্নি মন্দির এখনও আমাদের সকলের প্রধান তীর্থ। প্রথ
৭০০ বছর এই ভারতবর্ষে আমাদের কাটল বড় শান্তিতে। আমরা হিন্দুদের মতোই ধুতি
পরতে থাকলাম। আর মাথায় বাঁধি পাগড়ি। চাষবাস, কাপড় বোনা—এ সবই তখ
আমাদের কাজ।

হিন্দুস্থানে আসার পর সেই প্রথম ৭০০ বছর বড় সুখের গো। চাষবাস করি। কাপ
চোপড় বুনি। পহলবী আর ফারসি ভাষার বদলে গুজরাটি ভাষা শিখতে থাকি। বলতে
বলতে জামসেদ তাঁর বড় ছেলের দিকে তাকালেন।

জাহাঙ্গীর বলল, তখন অনজুমান— মানে পার্শি সমিতিগুলো সব ব্যাপারে পরাম
দেয় অগ্নি-পূজকদের। কি ভাবে দিন কাটাবে। কেনাবেচা, ব্যবসা কি ভাবে হবে
আয়ের পথ কি! অথোরনান মানে পুরোহিত আর ধর্মগুরুরা উপদেশ দেন পুজো-পা
আধ্যাত্মিক জীবনে নিয়ে। এভাবেই দিন যায়। বছরের পর বছর চলে যেতে থাকে।
দেশিয়— মানে ভারতবর্ষে থাকা পার্শিদের মধ্যে থেকে নেতা হিসেবে উঠে এলে
নওসারির চংগা আশা। সেটা ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ।

কলকাতায় মেটকাফ স্ট্রিটের অগ্নি-মন্দিরের দোতলার দেয়ালে জ্বলছে পূত আগুন
আলিমায়া। তার মৃদু আলোয় গোটা ঘর একটু একটু করে আলোকিত হয়ে উঠছে
সুন্দর স্নিগ্ধ আলো। জামসেদের চোখের সামনে এই ছবিটা ভেসে উঠল।

জাহাঙ্গীর বলল, এবার আমি যাই।

চলে যাবে?

হ্যাঁ। সময় হয়ে গেল।

যাও। যাবেই যখন, তোমাকে আর আটকাব না—বলতে বলতে মৃত সন্তানের জন্যে ভেতরটা তাঁর হায় হায় করে উঠল। আর তার পরই এই ওয়াদিয়া ম্যানসন-এর কোনো একটি ঘড়ি থেকে ঢং ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজার শব্দ পেলেন জামসেদ।

আলিমায়ার পবিত্র রোশনিতে গোটা ঘর ভরে আছে। পূত অগ্নির কি মহিমা। নওসারির চংগা আশার কথা বলছিল জাহাঙ্গীর। আমিও ওঁর কথা জানি। আমার মতোই ওঁকে জানেন আমার সম্প্রদায়ের অন্য অনেকে। তিনি ছিলেন ঐর্যানাম থেকে ভারতে এসে শিকড় ছড়ান পার্শিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ।

আলিমায়ার স্নিগ্ধ আলোয় ঘরের ভেতর গুজরাটের ভারলি নদীর তীরে সনজানকে নতুন করে যেন দেখতে পেলেন জামসেদ। সেই সনজান থেকে এক কিলোমিটারও হবে না, সেখানে ভিলবাদি গ্রাম। সেই গ্রামের মাটিতে বেড়ে ওঠা আম গাছটিকে নিজের ঘরের ভেতর দেখা যাচ্ছে। গাছের মোটা ডাল অনেকটা যেন লতিয়েই এগোচ্ছে জমি ছুঁতে ছুঁতে। সেই ডাল থেকে আবার নতুন গাছ। ঘরের ভেতর নবীন আম্র মুকুলের গন্ধ তোলপাড় করে দিচ্ছে জামসেদের মন। নিচু হয়ে হয়ে মাটি ছোঁয়া গাছের ডালেরা হাওয়ায় পাতা নেড়ে নেড়ে নিজেদের অসহায়তার কথাই যেন বলতে চাইছে জামসেদকে।

আমের মুকুলের জোরাল গন্ধ জামসেদকে গ্রাস করছে। নিজের দুই সন্তান, আর বউ এরুচশার জন্যে মনটা হঠাৎই একটু বেশি কেমন কেমন করে উঠল জামসেদের। আর তখনই ফোন বেজে উঠল।

গভীর রাতে, সকালে টেলিফোন ঝংকার তুললে মনের ভেতর উদ্বেগ দানা বাঁধে। কি জানি, আবার কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে হয়ত উড়ে আসছে ফোন-বার্তা। কিংবা এসব কিছুই নয়, আসলে সেই প্রোমোটারি হুমকি। যেমন বার বার ভেসে আসে ফোনে।

উঠে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কর্ডলেস রিসিভার হাতে তুলে কানে লাগাতেই সেই চেনা গলা—

কা বে বুঢ়োউ, তু সোচা কুছ?

ইউ বাস্টার্ড! এগেইন ইউ ডিসটার্বিং মি।

ডিসটারাব! এ কেয়া বোল রহা তু! কেয়া বোলতা রে— ডিসটারাব তো ম্যায় করতেহি যাউঙ্গা। করুঙ্গাহি। ম্যায় তুঝে খা লুঙ্গা বুঢ়োউ। হাঁ—কহে দিয়ে ম্যায়নে।

কাচ্চা চবাকে খালুঙ্গা। বাচকে কহি নহি যা সকেগা তু। ম্যায় তুঝে গিরাউঙ্গা। গিরাউঙ্গা শালে তেরে কো। আভি ভি বখত হ্যায়। ইয়ে জমিন, মকান ছোড়কে চলা যা তু। ভাই ইয়ে মকান খরিদেঙ্গে—হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে।

হু ইজ দ্যাট ফেলো—ভাই—দ্য ব্লাডি ব্লাস্টার্ড!

আংরেজি মে গালি কিঁউ দেতা রে তু! কিঁউ দেতা! হাঁ। বোল। বোল। তু ভি

হিন্দুস্থানী। ম্যায় ভি হিন্দুস্থানী। তব কিঁউ গালি আংরেজি পে দেতা হ্যায়? বোল বোল। চুপ কিঁউ হ্যায়?

আই উইল শুট ইউ ব্লাডি হেল।

শুট করে গা। শুট করে গা তু! অওর মুঝে? বলতে বলতে টেলিফোন রিসিভারের ওপারে কান ফাটান হাসি হাসতে থাকে সেই না দেখা কণ্ঠস্বর! —ঠিক হ্যায়। দেখ সপনা দেখ। গোলি মারনে কা খোয়াব দেখ। দেখতে চল।

অগর মুলাকাত হো যায় কভি ভি, কঁহি ভি। ম্যায় তুঝে জিন্দা ছোড়ুঙ্গা নহি।

ইয়ে হুয়ি না বাত। সমঝদার আদমিকে তরা তু হিন্দি মে বোলনে লাগা। বোলা ন: হাম হিন্দুস্থানী হ্যায়। তু ভি হিন্দুস্থানী। আ—হা-হা-আ- কেয়া সাহি কহা ম্যায়নে কহা না?

সকাল হতে না হতেই কি জ্বালা! মনটা খিঁচড়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। গোটা দিনটা খারাপ যাবে। ঘরের ভেতর সেই বুকে হাঁটা আমগাছটি আপন মনে ডাল-পাত দোলাচ্ছে। আমের মুকুলের গন্ধে আমোদ হয়ে যাচ্ছে গোটা ঘর। জামসেদের চারপাশে এখন আলিমায়ার আশ্চর্য আলো।

কা বে বুঢ়োউ! যো বোলা ইয়াদ রহেগা না! ইয়ে মকান ভাই খরিদনা চাহতে হ্যায় ভাই যো কুছ চাহতা হ্যায় সো হো হি যাতা হ্যায়। তেরা ইয়ে জমিন মকান-সব কুছ চলা যায়গা। কুছ নহি কর পায়গা তু। কুছ নহি কর পায়গা। আভি ভি বখত হ্যায় মকান, জমিন বেচ। পইসা লে। অর ভাগ যা হিঁয়াসে। তুরন্ত ফুট যা। কঁহি ভি একঠো ছোটামোটা ফ্ল্যাট খরিদ লে। ইয়া কিরায়া মে রহে যা। অকেলা আদমি হ্যায় তু। ন লড়কা না জরু। কই নহি হ্যায় তেরেকো। কেয়া করেগা, কেয়া করেগা তু ইতনা বড় মকান, ইয়ে ঢের সা জমিন লেকে! ছোড় দে। ছোড় দে সব। অর ছোড়কে চলা যা ম্যায় তেরা আচ্ছাই চাহতা হুঁ। ইসিলিয়ে বোল রহে হ্যায়।

আ বে ভাই কা পালতু কুত্তা। কিঁউ ছুপ ছুপকে ভঁওকতা হ্যায়। চল, নিকাল আ অওর মুলাকাত হো যায়। দেখনা কিসকো বাজুমে তাকত জাদা হ্যায়।

আ বে—তু কা তাকত দেখে গা মেরে কো? কেয়া দেখে গা! ম্যায় গোলি সে তেরা খোপরি চিথরা কর দুঙ্গা। ম্যায় যো কিয়া হ্যায় তেরে বিবিকো। আভি ভি কহে রহা হুঁ। অভি ভি বখত হ্যায়। সমহাল অপন কো। সমহাল লে। মেরা পাস সে পইসা লে অর মকান ছোড়কে নও দো ইগারা হো যা। সমঝা কি নই! সমঝা—হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে।

আই আনডারস্ট্যান্ড। আই আনডারস্ট্যান্ড এভিরিথিং। বলতে বলতে মাথার রক্ত অনেকটা এক সঙ্গে লাফ দিয়ে জামসেদের ফরসা মুখে আছড়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ নাকের পাটা উত্তেজনায় তির তির তির তির করে কাঁপছে। সমস্ত মুখ, নাক, কান থেকে মনে হচ্ছে রক্ত ফেটে বেরিয়ে আসবে। হাতে ধরা কর্ডলেস রিসিভার একটু একটু করে কেঁপে উঠছে।

জামসেদ বুঝতে পারছেন তাঁর ভেতরে একটা উত্তেজনার চোরাস্রোত ওঠানামা করছে। রিসিভার ধরে ভয় দেখান নানারকম কথা শুনতে শুনতে জামসেদের মনে হলো বিছানায় মাথার কাছে রাখা লোডেড কোল্টটা নিয়ে এসে রিসিভারেই ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপে দি। দেখতে তো পাচ্ছি না বদমাইশটাকে। কিন্তু রাগ তো তর তর করে বেড়ে উঠেছে। এমন হতে থাকলে তো নিজেরই ক্ষতি।

যদি মাথা ঘুরে পড়ে যাই ঘরের মেঝেয়, কলঘরে? কিংবা আছড়ে পড়ি অন্য কোথাও! তাহলে তো নিজেরই বিপদ। বন্ধ ঘরে মরে পড়ে থাকব। অনেক অনেক পরে টের পাবে সরস্বতী। তখন তো যা হওয়ার হয়ে গেছে। রিসিভারের উল্টো দিক থেকে সেই গা-জ্বালানো কথা আবারও ভেসে আসছে।—কেয়া রে বুঢ়োউ! চুপ কিঁউ হো! ডর কে মারে মর গ্যয়া কা? বাত নহি নিকল রহে হ্যায় মু সে! বাত কেয়া হ্যায়?

ইউ ব্লাডি সোয়াইন! ম্যায় শের হুঁ। শের। শের কভি চুহা সে না ডরতে হ্যায়। না ভাগতা হ্যায়!

কেয়া বোলা! কেয়া বোলা তু—বলতে বলতে রিসিভারের ও প্রান্ত থেকে আবারও হা-হা-হা করে ব্যঙ্গের হাসি ভাসিয়ে দিল সেই কণ্ঠস্বর। তার হাসির টানে পরিষ্কার ফুটে উঠল ব্যঙ্গ আর তাচ্ছিল্যের রেখা।

কেয়া বোলতা তু—শালে বুঢ়োউ! ম্যায় বোলা না—বোলা না ম্যায়—ভাইকা গুসসা তু নহি জানতা হ্যায়। কাঁহা সে কাঁহা য়ো টুট পড়ে গা, ইয়ে ভি না পতা। লেকিন ইয়াদ রাখনা, ইয়াদ রাখনা— শুনলে কান খোলকে— এ বুঢ়োউ কান খোলকে শুনলে—ম্যায় তুঝে কাচ্চা খা যাউঙ্গা। গোলি সে ভুনে গা ভি নহি। একদম খা যাউঙ্গা কাচ্চা। হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে।

তেরা ইয়ে কাচ্চা খানেকা অ্যায়সি কি ত্যায়সি। কান খোলকে শুনলে ভাইকা বাচ্চা। শুনলে। তু তো ডরপোক হ্যায়। ডরপোক। তু কেয়া খায় গা মুঝে! কেয়া খায় গা, হাঁ! ম্যায় তো ফির বোল রহা হুঁ। অগর তু সাচমুচ মর্দ হো, তেরে কো হিম্মত হ্যায়, তো নিকল আ। নিকাল বাহার। খটমল, তেলচাট্টা অওর চুহে কে তরা কিঁউ ছুপ ছুপকে রহতা হ্যায়? কিঁউ ভাগতা হ্যায় কুত্তোঁকা তরা দুম দাবাকে? নিকাল, নিকাল বাহার।

বুঢ়োউ, তু বড়া খিসিয়ায় গ্যয়ে। তেরা ইয়ে খিসিয়ানপন মুঝে বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়। আউঙ্গা, আউঙ্গা ম্যায়। লেকিন যো রোজ আউঙ্গা দেখ না কেয়া হো যায়গা। সারে সে সারে আসমান টুট পড়েগা তেরা শর কা উপ্পর। হাঁ—আ— ম্যায় মজাক নহি কর রহা হুঁ। সাহি বোল রহা হুঁ। একদম সাহি। ভাইকা গুসসা তু নহি জানতা বুঢ়োউ। তু নহি জানতা। হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে। বলতে বলতে ও প্রান্তে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

লাইনটা কেটে গেল।

কান থেকে রিসিভার সরিয়ে নিয়ে মুখের কাছে এনে সেদিকে বড় বড় চোখ করে একবার তাকিয়ে দেখলেন জামসেদ। তারপর আস্তে আস্তে সেটিকে জায়গা মতো রাখলেন।

বাইরে ফরসা হয়ে গেছে। পাখি ডাকছে বাগানে। কি সুন্দর, কত রকম তাদের ডাক। কানে শুনলে ভেতর অব্দি প্রসন্ন হয়ে ওঠে।

রানা জয়দেব উদ্বাস্তু পার্শিদের জায়গা দিয়েছিলেন তাঁর রাজত্বে। কিন্তু শর্ত ছিল এই নবাগতরা সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র বহন করতে পারবেন না। অস্ত্রশস্ত্র রাখবেনও না। কিন্তু ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে যখন মাহমুদ বেগড়া এসে গুজরাট আক্রমণ করলেন, তখন স্থানীয় হিন্দু রাজার পক্ষে ১৪০০ পার্শি অস্ত্র ধরেছিলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন মহাবীর আর্দেশীর।

কেমন ছিল তাঁর চেহারা? ভারতে গিয়ে জামসেদ ওয়াদিয়া নিজের ভেতর খুঁড়তে থাকলেন।

এর মধ্যেই নতুন সকাল এসেছে। কিন্তু জামসেদের আজ আর সেদিকে যেন তেমন নজর নেই। তবু নিজের নিয়মে সকাল বেড়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা কথা জেগে উঠতে চাইছে জিজ্ঞাসা হিসেবে। কেমন দেখতে ছিল মহাবীর আর্দেশীরকে? কেমন ছিল তাঁর গলার স্বর, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, অসি বা ভল্ল চালানোর কৌশল! তীর ছোঁড়ার কায়দা। কেমন করে সাজাতেন তিনি ব্যূহ? পরিচালনা করতেন সৈন্যদের?

ভাবতে ভাবতে একটু সরে গিয়ে মাথার কাছে রাখা লোডেড কোল্ট ডান হাতে আলতো করে তুলে নিলেন জামসেদ। বেশ ঠাণ্ডা। ইস্পাতের বড়ি, নল যেমন হয়। ছ-ছটা থ্রি এইট বুলেট আছে ভেতরে। আমি কি পারব এই ছটা টোটাই ঐ হুমকি দেখান লোক-টার বা ভাইয়ের গায়ে মালা করে পরিয়ে দিতে? ভাবতে ভাবতে চেম্বারটা খুলে সাজান গুলিগুলো দেখে নিলেন জামসেদ। তারপর বন্ধ করলেন। আবার খুললেন। বন্ধ করলেন। এ ভাবেই চলল কিছুক্ষণ। বেশ কয়েকবার খোলা-বন্ধ পর্ব। তারপর এক সময় টেবিলের ড্রয়ার টেনে ঢুকিয়ে রাখলেন তার ভেতর।

এবার চড়া করে রোদ উঠে আসার আগে নিচের বাগানে গিয়ে বসবেন ঠিক করলেন। সকাল হওয়ার আগে থেকেই ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন জামসেদ।

পাঁচ

খবরটা কলকাতা এডিশনের একটা ইংলিশ ন্যাশনাল ডেইলিতে বেরিয়েছে। ঠিক খবর হিসেবে নয়, নিউজ ফিচার হিসেবে। গাছের ছবিও দিয়েছে। সনজানের কাছে ভিলবাদি গ্রামে লতিয়ে চলা আমগাছ। তার ছবি—সব মিলিয়ে বেশ বড় রিপোর্ট। খবরটা জামসেদের চোখে পড়ল। তারপর বেলার দিকে তিনি আরও কয়েকজনের ফোন পেলেন।

ফিরোজ তো আগেই আমায় জানিয়েছে গুজরাট থেকে এস টি ডি করে। কাল কাগজে খবরটা পড়লাম। অন্যদের আসা ফোনের উত্তরে এসব বলতে হচ্ছে জামসেদকে।

লনে পাতা মেহগনির সাবেক ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। চারপাশে অন্যরকম সবুজ পৃথিবী। গাছ-পাতার সবুজের ভেতর দিয়ে দিয়ে ফিলটার হয়ে আসা রোদ্দুরের রঙও কেমন যেন অন্য রকম। তার সঙ্গে মিশে যায় আশ্চর্য আশ্চর্য পাখির ডাক। আড়াল থেকে, যেমন অন্য দিন হয়, তেমনই সেই নিজেকে লুকিয়ে রাখা পাখিটা আজকেও ডেকে উঠল—টু-হি-টু-হি—টু-হি।

এই সময়টাতেই পৃথিবীর স্নিগ্ধ রূপের ভেতর চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। মেহগনির ইজিচেয়ারে নিজেকে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে আধশোয়া হয়ে থাকেন জামসেদ।

৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঐর্যানামের কোহিস্তান থেকে সরে এসে হরমুজ বন্দর থেকে রওনা দিয়ে ভারতের গুজরাটে পৌঁছনোর পর অগ্নি-উপাসকরা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল বোচ, খম্বাত, নওসারি, সুরাটে। খম্বাতের নাম পরে হয়ে গেল ক্যাম্বে। আরও পর তারা সরে গেল বোম্বাই, পুনা, করাচি, জামসেদপুর, কলকাতায়। সারা পৃথিবী জুড়েই তো মানুষ ঠাঁইনাড়া হয়ে অনবরত ঘর বদল করে। কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে, করতে বাধ্য হয়। বসনিয়া, চেচনিয়া, প্যালেস্তাইনের শরণার্থীরা দৌড়ে দৌড়ে যায় জামসেদের সামনে দিয়ে। ওফ, কি আতঙ্ক নিয়ে ছুটছে মানুষ। দল দল মানুষ। খাবার নেই। নিরাপত্তা নেই। যে কোনো সময় প্রাণ চলে যেতে পারে বুলেট কিংবা বোমায়।

জামসেদের মনে পড়ল কবেই তো ঘর ছেড়েছিল আব্রাহামের সন্তান ইহুদিরা। ছেড়ে গেছিল তাদের নিজেদের বাসভূমি। তারপর অনেক অনেক বছর পর সেই আব্রাহাম-সন্তানদের যখন জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো ইজরায়েলে, তখন আর এক দল মানুষ আবার উৎখাত হলেন। তাঁরা প্যালেস্তাইনের শরণার্থী। চালু হয়ে গেল যুদ্ধ। নিয়মিত গোলাগুলি, বোমাবাজি, সন্ত্রাস। পাল্টা সন্ত্রাস। কাঁটাতার আর অবিশ্বাস গজিয়ে উঠল রাতারাতি।

জামসেদ দেখতে পেলেন সিরিয়া, লেবানন, গোলান হাইটস—মানচিত্রে আঁকা এই সব নামের গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে নামছে। অনেক রক্ত। নিরাশ্রয় ফিলিস্তিনি শিশু, বুড়োমানুষ, মেয়েরা মন খারাপ করে বসে আছে উদ্বাস্তু শিবিরে। এরও কত বছর আগে হিটলার জার্মানি ছাড়া করেছিল ইহুদিদের।

জামসেদের বন্ধ চোখের সামনে দিয়ে সার্বরা হেঁটে যায়। দল বাঁধা সার্বরা বাধ্য হচ্ছে ঠিকানা বদল করতে। কাশ্মীর থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসছে হিন্দু পণ্ডিতরা। একটার পর একটা কাশ্মিরী হিন্দু পণ্ডিত পরিবার ভিটে মাটি থেকে উৎখাত হয়ে

বছরের পর বছর থাকতে বাধ্য হচ্ছে দিল্লিতে, শরণার্থী শিবিরে। তাদের ঘর-বাড়ি সম্পত্তি নির্বিচারে দখল হয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরে। চেচনিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া থেকে দৌড়ে দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যেতে চাইছে মুসলমানরা।

আর একটু পেছনে, ১৯৭০-৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উদ্বাস্তু দল বেঁধে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসছে, খান সেনার ভয়ে। সাত পুরুষের ভিটে-মাটি, মান-সম্মান, ইজ্জত—সব গেছে। খাবার নেই। জল নেই। শুধু চলা। সামনে চলা। সীমান্ত পেরিয়ে কোনোরকমে ঢুকে পড়া ইনডিয়ার মাটিতে। তারপর অনেক কষ্টে জায়গা করে নেয়া শরণার্থী শিবিরে শিবিরে।

তারও আগে ছেচল্লিশের দাঙ্গা। দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। ওপার থেকে পায়ে হেঁটে, ট্রেন বোঝাই করে চলে আসছে হিন্দু আর শিখেরা। বৌদ্ধরাও। এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে মুসলমান উদ্বাস্তু। কারোরই হাতে কোনো সম্বল নেই। দু'চোখে শুধুই ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভয়। কোথায় যাবে জানে না। সে এক অনিশ্চিত যাত্রা।

শুধু জ্যান্ত মানুষই তো নয়, লাশ বোঝাই ট্রেন যাতায়াত করেছে এপার থেকে ওপারে। ওপার থেকে এপার। সেই বদলা। বদলা। খুন। পাল্টা খুন। শবের পাহাড়। সেই সব মৃতদেহ সৎকারের লোকও নেই।

কোহিস্তানের পর্বত-কন্দর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা হে আমার পূর্বজরা—সময় বদলালেও শরণার্থী হওয়ার যন্ত্রণা, ভিটেমাটি, সমস্ত সম্বল হারিয়ে পথে নামার যন্ত্রণা শেষ হয়নি মানুষের। মানুষ এখনও মূলত উদ্বাস্তুই। এটুকু ভেবে বন্ধ চোখের সামনে ছবি হয়ে জেগে থাকা সেই বুক বেয়ে বেয়ে এগিয়ে এগিয়ে চলা আমগাছটিকে দেখতে পেলেন জামসেদ। শুধু তো মানুষ নয়, গাছও—রেহাই নেই। খুব আস্তে বিড় বিড় করে বলতে বলতে জামসেদ দেখতে পান বিষণ্ণ আমগাছটিকে। তার ডালে-পাতায় মন খারাপের চিহ্ন। এ গাছ কি কাটা পড়বে শেষ পর্যন্ত? মুছে যাবে ভারতের মাটি থেকে। কবে—সেই কত কত বছর আগে ঐর্যানাম ছেড়ে আসার সময় দেশঘরের কিছু কিছু স্মৃতির সঙ্গে এই গাছটি এসেছে—ঐর্যানাম থেকে ভারতের মাটিতে। সেও তো আজ বহুদিন হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা ভিজে উঠল জামসেদের।

তাড়াতাড়ি ডান হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল মুছে মেহগনির ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন। হাতের কাছে ছোট টেবিলের ওপর রাখা কর্ডলেসের দিকে চোখ গেলে কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার ঘাড় এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারের ক্যানভাসে।

পাখির ডাক—টু-হি-টু-হি নতুন করে ছুঁয়ে যেতে থাকে জামসেদকে। তারপর এক সময় চারপাশে কেমন যেন আবছা আবছা কুয়াশা ফুটে ওঠে। ঐর্যানামের কোহিস্তান থেকে লুকিয়ে চলে আসা সেই সব মানুষদের কেউ কেউ, কিংবা তারাই হয়ত নয়, তাদের পরের সময়ের অন্যরা এসে দাঁড়ান সামনে।

সেই মাথায় শাদা পাগড়ি বাঁধাদের কোনো কোনো জন তাঁদের মেঘলা শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা গাছের পাশে, আড়ালে এসে দাঁড়ালেন।

সুরাটের কাছে পার্শিদের সঙ্গে দেখা হলো হিন্দুস্থানের বাদশা জালালুদ্দিন আকবরের সঙ্গে।

কেমন যেন একটা ঘোরের ভেতর ইজিচেয়ারে নিজেকে আরও আলগা করে দিলেন জামসেদ।

মহাবলী আকবর—তামাম হিন্দুস্থানের মালিক—বাদশাহ আকবর উৎসাহিত হলেন অগ্নি-পূজকদের ধর্মে। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন পার্শিনেতা দসতুর মেহেরজি রানাকে। আগ্রা তখন মুঘল হিন্দুস্থানের রাজধানী। সুরাট থেকে আগ্রায় এলেন দসতুর মেহেরজি। জামসেদ ওয়াদিয়া শুনতে পাচ্ছেন সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর—শাহেনশা আকবর, দীন-ই ইলাহি ধর্মের প্রবক্তা আকবর দসতুর মেহেরজি রানাকে বললেন, আপনাদের অগ্নি দেবতার প্রতি আমার যথেষ্ট সম্ভ্রম রহিয়াছে।

সেটা ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ফতেপুর সিক্রিতে পার্শি মতে উপাসনার জায়গা—অন্যান্য ধর্মের উপাসনা স্থালের পাশাপাশি তৈরি করেছিলেন মহানুভব হিন্দুস্থানের বাদশাহ।

শাহেনশা আকবর পার্শি পোশাক আর পবিত্র যজ্ঞসূত্র ও উত্তরীয়—কুস্তি আর সদবা ধারণ করেন।

এতটাই মহানুভব ছিলেন সম্রাট। তিনি ভারতবর্ষের নাড়ির স্পন্দন বুঝতে পারতেন। নিজের মনে নিজেই বিড়বিড় করে বললেন জামসেদ ওয়াদিয়া।—হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতোই পৈতে গলায় দেন পার্শি—অগ্নি উপাসকরা। তার নাম কুস্তি। সেই কুস্তি গলায় পরলেন দিল্লিশ্বরো জগদীশ্বরোবা। সদবা নিলেন।

জামসেদ ওয়াদিয়া শুনতে পাচ্ছেন সেই অলৌকিক গলা।

সম্রাট আকবর তো পার্শি বর্ষপঞ্জি ও নওরোজ—নববর্ষ দিবস পালন প্রথা গ্রহণ করলেন পার্শিদের কাছ থেকে। তিনি নওরোজ পালন করতেন। ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা সেজে উঠত দীপমালায়। প্রদীপের আলোয় সমস্ত শহর অন্যরকম হয়ে উঠত।

চোখের সামনে ফতেপুর সিক্রি, আগ্রার প্রাসাদ, ঘরবাড়ি, মিনার—সব আলোয় আলো, দেখতে পাচ্ছেন জামসেদ ওয়াদিয়া। আকবরের প্রিয় হাতি হিরণের স্মরণে হিরণ মিনারের মাথাতেও আলো। সেই আলোরা দুলতে দুলতে হয়ে উঠছে আলোর মালা।

১৫৭৮ থেকে উনপঞ্চাশ বছর আগে—১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে পাটনায় অজার কৈরান নামে একজন বিদ্বান মানুষ, তাঁর বিদ্যাবত্তা আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন সবাইকে। তিনিও একজন আগ্নি-পূজক—পার্শি। সারা হিন্দুস্থানে তখন সবে মুঘল হুকুমত জারি হয়েছে। হিন্দুস্থানের মালিক তখন বাবর বাদশা। ১৫২৬ -এ প্রথম পানিপথের যুদ্ধে তিনি হারিয়ে দিয়েছেন ইব্রাহিম লোদিকে। পাঠানি হুকুমত সরিয়ে দিল্লির তখত-এ তাউস-এ বসল মুঘল বাদশারা।

জামসেদের সামনে তখনও আকবর বাদশা রয়েছেন। তাঁর গায়ে কুস্তি ও সদবা।

বড় বড় গাছের আড়াল থেকে সেই পাখিটা সমানে ডেকে গাচ্ছে—টু-হি-টু-হি-টু-হি। গাছের পেছনে, পাশে দাঁড়ান সেই সব তস্য তস্য তস্য বুড়ো ঠাকুরদারা নিজেদের ভেতর কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁদের কথা কিছু শোনা যাচ্ছে। কিছু শোনা যাচ্ছে না।

মহান বাদশা জালালুদ্দিন আকবর তাঁর লালচে ভারী চেহারাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলশালী শাহেনশার গলায় মুক্তোর মালা। মাথায় উষ্ণীষ। গোঁফটি ঝুলে নেমে এসেছে ঠোঁটের দুপাশে। গালে একটি বড় আঁচিল। তিনি প্রচার করছেন দীন-ই-ইলাহি ধর্মের। তাঁর হাতে দসতুর মেহেরজি ও অন্যান্য পার্শিদের দেয়া কুস্তি আর সদবা।

আপকা খানা সাব।

সরস্বতীর কথায় ঘোর ভেঙে যায়।

ডিমের ওয়াটার পোচ। মাখন ছাড়া টোস্ট।

জামসেদ হাত বাড়িয়ে খাবার নিলেন না। চোখ বুজে বুজেই বললেন, মেজ পে রাখ দো।

সামনে—টেবিলের ওপর খাবার নামিয়ে রাখল সরস্বতী। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না জামসেদের। আবার খেতে হবে। খাওয়া মানেই চিবনো, মুখ ধোয়া। উঠতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু খেতে হবেই। খিদে পাচ্ছে যে। এটুকু ভেবে চোখ খুললেন জামসেদ। তারপর হাত লাগালেন খাবারে।

একটু দূরে সেই পাখিটা সমানে ডেকে চলেছে। —টু-হি-টু-হি-টু-হি।

মহামতি সম্রাট আকবর বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষে—তামাম হিন্দুস্থানে শুধু চোখ রাঙিয়ে সৈন্য সাজিয়ে আর ভয় দেখিয়ে হুকুমত কায়েম রাখা যাবে না। বাগী মানুষদের বুঝতে হবে। কাছে টেনে নিতে হবে। সব ধর্মের মানুষের জন্যে রাখতে হবে সমান অধিকার। এদেশে গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা চলবে না। হিন্দুস্থান কখনই শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমান বা কেবল পার্শি অথবা জৈন, বৌদ্ধ, ইহুদি, শিখ কিংবা খ্রিস্টানের দেশ নয়।

তিনি সর্ব ধর্ম চর্চার ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সব মানুষকে—সমস্ত পথ ও মতের মানুষদের কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন।

পাখিটা আবারও ডেকে উঠল—টু-হি, টু-হি-টু-হি।

তারপর তারা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের রঙবাহার নিয়ে নাচতে লাগল জামসেদকে ঘিরে। একবার দুবার তিনবার—বারবার ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে নাচ হচ্ছে। কি সুন্দর সেই দৃশ্য। খেতে খেতে নিজের টোস্ট করা পাউরুটির কোণা ছিঁড়ে সেই রঙবাহারি পাখিদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন জামসেদ। পাখিরা খেল!

আবার দিলেন। আবারও তারা ঠোঁটে করে তুলে নিল।

গান গাইতে গাইতে কথা বলে উঠল একটা পাখি। যেমন তারা বলে। কুয়াশা কুয়াশা চেহারা নিয়ে বড় বড় গাছের পাশে, আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা তস্য তস্য তস্য

তস্য বুড়ো ঠাকুরদা আর ঠাকুরদারা কখন যেন চলে গেছেন, মিশে গেছেন হাওয়ায়। সেই পাখিরা সামান্য সামান্য ডানা ঝাপটে, নিজেদের ঠোঁট নেড়ে কত কি বলে যাচ্ছে জামসেদ ওয়াদিয়াকে ঘিরে, নাচতে নাচতে।

তিনটি পাখি জামসেদকে ঘিরে নাচছে তাঁরই বাড়ির লনের ওপর। লম্বায় প্রায় এক হাত হবে। সারা গা উজ্জ্বল কমলা। গলায় কালো দাগ। ঠোঁটটি টুকটুকে লাল। মাথায় কালো ঝুঁটি। দু চোখেও চুনির দুটি বিন্দু। দেখতে দেখতে মন ভালো হয়ে যায়। তাদের গলায় আসাধারণ গান। সেদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে জামসেদের মনে হলো, এরাই কি স্বর্গের পাখি? সোজা নেমে এসেছে স্বর্গ থেকে! ভাবতে ভাবতেই জামসেদ ওয়াদিয়া পাখিদের বলা কথা শুনতে পেলেন স্পষ্ট।

পাখিরা বলে উঠল, নিজের দেশে তো বটেই, ভারতে এসেও বারবার বিপদে পড়েছে পার্শিরা। ইব্রাহিম গজনভি ১০৭৯ খ্রিস্টাব্দে ও তৈমুর ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে—ব্যাপক খুন-খারাপি লুট-তরাজ চালায়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্বেতে খুব মারামারি, পার্শিদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে। তারপর রারিয়রের সেই ঘটনা।

বলতে বলতে পাখিরা জামসেদের ইজিচেয়ার এক পাক করে প্রদক্ষিণ করে নেচে নিচ্ছে। তারপর নাচতে নাচতে কথা বলছে। গান গাইছে। সেই গানও যেন কথা হয়ে ভেসে আসছে জামসেদের কানে। সে এক অসাধারণ অনুভূতি।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা লুটপাট করল সনজান। অত্যাচারও চালাল খুব। সেই ধাক্কা এসে পড়ল পার্শিদের ওপর। পাখিদের কথা শুনতে শুনতে জামসেদ যেন পৌঁছে গেলেন ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের সনজানে। বেশি নয়, মোটে চারশো চল্লিশ-একচল্লিশ বছর আগে। কামান, তলোয়ার, বন্দুক হাতে সাত সমুদ্র পেরিয়ে আসা পর্তুগিজরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সনজানের ওপর। তখনই নিয়ন্ত্রিত দাস ব্যবসা করে পর্তুগিজরা। গ্রামের পর গ্রামে লুটপাট চালিয়ে বন্দি করে নিয়ে যায় মানুষদের। তারপর জাহাজের খোলের ভেতর তাদের লাদাই করে পাঠায় এখানে-ওখানে।

অন্ধকার জাহাজের খোলের মধ্যে আলো-হাওয়ার বালাই নেই। গোরু, ভেড়া, মুরগিদের থেকেও খারাপ ভাবে থাকে মানুষ। খাবার নেই। জল নেই। গায়ে তেমন জোর না থাকলে অনেকেই পটকে যায় সেই জাহাজের পেটে। মরা মানুষটাকে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয় হারমাদরা।

বুড়ো-বুড়িদের প্রায় তেমন কদরই নেই। কোনো কাজে লাগবে না এরা। উপরন্তু বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে। আর বসে থাকবে জায়গা জুড়ে। তাই বুড়ো-বুড়িদের নেয়ার দরকার নেই দাসহাটে। ওদের ফিনিশ করে দাও। শক্ত-সমর্থ পুরুষ, মেয়ে, ছোটদের দর ভালো পাওয়া যাবে। তাও খুব শিশুদের কোনো প্রয়োজন নেই।

এসব কথা নিয়ে নিজের মনে তোলপাড় করতে করতে দাসবাজারে নিয়ে যাওয়া মানুষদের একটা ছবি ফুটে উঠছে জামসেদের সামনে। সেটা সুবে বাংলাই হবে—বাংলা বিহার উড়িষ্যা তখন একই ম্যাপের দাগের ভেতর। আলাদা নয়।

জামসেদ দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় একটা গাছের নিচে শেকলে বাঁধা মানুষদে
সার দিয়ে বসিয়ে রেখেছে পর্তুগিজ দস্যুরা। সময়টা গরমের। দুজন পর্তুগিজ
নিজেদের ভেতর কথা বলছে। তাদের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। মাথায় চামড়ার টুপি
দু কোমরে ঝোলান আছে পিস্তল আর ধারাল তলোয়ার। কাছেই একটা নদী। সে
নদীপথেই এসেছে এই সব হানাদাররা।

যে মানুষগুলো শেকল বাঁধা অবস্থায় গোরু-ছাগল হয়ে গাছতলায় বসে আছে
তাদের চোখে কোনো ভাষা নেই। কেমন যেন মৃত মানুষের চোখ, মুখ, ছায়া ভ
করেছে তাদের চোখে-মুখে। শূন্য দৃষ্টি। ফ্যালফ্যালে চাউনি। মাথার চুল উলিঝুলি
জামা-কাপড় প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। যা আছে, তাও ময়লা। শতচ্ছিন্ন।

রডরিগস, মনে হচ্ছে এবার আমাদের পরিশ্রম পুষিয়ে যাবে। মাল নেহাৎ ক
হলো না।

তুমি ঠিকই বলেছ পেড্রো। কিন্তু মাল নিয়ে যাওয়ার সমস্যা আছে
নবাবের—সুবেদারদের নৌকো মাঝে মাঝে তাড়া করে।

ও আমি ঠিক সামলে নেব। বলতে বলতে খয়েরি চোখের তারা নাচিয়ে হাস
রডরিগস।

জামসেদ দেখতে পেলেন প্রায় সাড়ে ছয় বা পৌনে সাত ফিট লম্বা রডরিগসে
পায়ে চামড়ার বুট। হাঁটু অব্দি সেই বুটের গায়ে-মুখে বাংলার গ্রামের ধুলো। মাথা
টুপিতে সময়ের দাগ। সমুদ্রের নুন, পথের ধুলো, নদীর কাদা—সবই সেখানে জড়িয়ে
মড়িয়ে একসা হয়ে আছে। টুপির বাইরে রডরিগসের তামাটে সোনালি চুল এলোমেলে
ভাবে বেরিয়ে আছে। হাফ হাতা চামড়ার জ্যাকেট পরা রডরিগসের ফর্সা বাহু কবজি
রোদে, সমুদ্রের নুন মাখা বাতাসে পুড়তে পুড়তে এখন অনেকটাই তামা রঙের। ডা
হাতের সেই বাহুর ওপর একটি সিন্ধুঘোড়ার উলকি। কনুই আর কবজির মাঝামাঝি
জায়গায় একটি ডানা মেলা উড়ন্ত বাজ অথবা ঈগল। সেই পাখির ধারাল নখে বিঁ
আছে কোনো শিকার। সে হতে পারে একটা বুনো খরগোশ অথবা মেঠো ইঁদুর। কিংব
হয়ত কিছুই নয় এসব। একেবারে অন্য কিছু। সেটা যে কি জানে একমাত্র উলকিঅলা
যে উলকি এঁকেছে রডরিগসের হাতে।

পেড্রোর ডান হাতেও উলকি রয়েছে। সেই ছবিতে একটি কিশোরী। তার দু-চো
জল। মুখের ভাঁজে স্থায়ী বিষাদ। আবার দু-বাহুতে—তামাটে, জোরাল দুই বাহু
মাসলে জোড়া তলোয়ার, কামান—এমন সব উলকি করা।

রডরিগস দাঁত চেপে হাসলেও তার মুখের ভাঁজে ভাঁজে এক ধরনের চাপা নিষ্ঠুরত
ফুটে ওঠে। সাজানো দাঁত তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। দু-চোখের তারাতেও নৃশংসতা।

গরমে অস্থির হয়ে পেড্রো খুলে ফেলল মাথার টুপি। তার মাথা জোড়া চকচ
টাকে বেলা বারোটার সূর্য আলো দিতে দিতে লাফ দিয়ে পড়েছে। সেখানে বিন্দু বি

মের দানা। সেই ইন্দ্রলুপ্তির দিতে তাকিয়ে তাকিয়ে রডরিগস বলল, দিনের বেলাটা খানে—এভাবেই কোনোরকমে কাটিয়ে দেব। তারপর রাত হলে দেখা যাবে।

তাই কর। তবে ভাই বড্ড গরম। আর টেকা যাচ্ছে না। বলতে বলতে মাথার টুপি লিয়ে দুলিয়ে হাওয়া খেতে লাগল পেড্রো।

আমিও আর পারছি না। কি গরম রে বাবা---বলতে বলতে রডরিগস মাথা থেকে পালে চুঁইয়ে নেমে আসা ঘাম হাত দিয়ে কাচাল। —গাছের একটা পাতা অব্দি ড়ছে না।

জল জল—একটু জল।

পানি, পানি—পানি।

সার দিয়ে বসান, শেকল-বাঁধা উলিঝুলি মানুষেরা এই গরমের কষ্টে কাতর হয়ে জল চাইছে। একটু জল।

কাছাকাছি জল বলতে ঐ নদী। কিন্তু এতগুলো হাভাতেকে জল এনে খাওয়াবে কে?

কিন্তু না খাওয়ালেও তো উপায় নেই কোনো। শরীর বেশি খারাপ হয়ে গেলে দাসহাটে বিকোতে চাইবে না। টাকাও পাওয়া যাবে না। যারা ক্রীতদাস কেনার জন্যে দাসবাজারে আসবে, তারা তো তাগড়া, কাজ করতে পারে---পরিশ্রমী, দেখতে ভালো, খুঁতো নয়—এমন মানুষই তো খুঁজবে। সেখানে রোগা-পটকা, হাড় জিরজিরে লোকজন তো একেবারেই চলবে না।

জল। জল। জল। গরমে কাতরাচ্ছে মানুষগুলো।

একটু পানি। পানি। পানি।

খাপ মোড়া পিস্তলে হাত ছোঁয়াল রডরিগস। তারপর বাজখাঁই গলায় পর্তুগিজ ভাষায় হুমকে উঠল, চু-উ-প—একদম চুপ। মুখ দিয়ে যেন টুঁ শব্দটি না বেরোয়।

সেই দলা পাকান মানুষগুলো কেমন যেন চুপসে গেল এই মহাধমকে। তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে আবারও চেঁচিয়ে উঠল—জল। জল। জল। পানি। পানি। পানি।

শেকল-বাঁধা সেই সব মানুষদের কাতর চিৎকার শুনে রডরিগসের হাতে লসবোঁয়ার রাস্তার ধারে বসে উলকি করান উড়ন্ত বাজ অথবা ঈগল যেন ঠোঁট ফাঁক করে ডেকে উঠল করুণ সুরে। একবার দুবার তিনবার। আর বাহুর ওপর উলকি হয়ে ভেসে থাকা সিন্ধুঘোড়াটি তার মাথা নাড়িয়ে, ল্যাজ ঝাপটে কি যেন কি একটা বলতে চাইল।

পেড্রোর হাতে উলকির কিশোরী-চোখে জল আরও টলটলে হয়ে উঠল। সেই নোনা জলের ফোঁটা একটু একটু করে গড়িয়ে নামতে চাইল।

রডরিগস বা পেড্রো অবশ্য কিছুই দেখতে পেল না এইসব। তাদের দু জোড়া কানের ভেতর জল, জল, পানি, পানি—এই শব্দরা ক্রমশ গজাল-ঠোকা হয়ে বসে যাচ্ছে। কি একটা বড়সড় পাখি সেই সব শেকল-বাঁধা হাভাতে মানুষদের মাথার ওপর দিয়ে ডানা ঝটপট করতে করতে তখনই উড়ে গেল।

গরমে অস্থির হওয়া সেইসব মানুষরা ঘামতে ঘামতে ক্রমশ নেতিয়ে পড়
তাদের গলা থেকে তখনও ফুটে উঠছে খুবই ক্ষীণ আওয়াজ—জল, জল, একটু জ
পানি, পানি, পানি—

বাবুজি, অওর চায় দুঁ কেয়া?

সরস্বতীর ডাকে ঘোর ভেঙে যেতেই গোটা ছবিটা সরে গেল জামসেদেব সা
থেকে।

একটু ধড়মড় করেই যেন ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, হাঁ দো।

এঁহি লে আউ?

হাঁ। হাঁ। এঁহি লাও। বলতে বলতে ঠাণ্ডা এক গ্লাস জলের জন্য গলা শুকি
জামসেদের। ভয়ঙ্কর তেষ্টা। তৃষ্ণায় জিভটা ভেতর অব্দি যেন টেনে নিচ্ছে
গ্লাসে হাত বাড়াতে গিয়ে জামসেদের মনে হলো—ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর এখ
ঘণ্টা হয়নি। খাবার খাওয়ার পর কম করে এক ঘণ্টা বাদ দিয়ে জল খাওয়া।
এটুকু ভেবে হেলান দিলেন জামসেদ।

ছয়

আজ ঠাকুরপুকুর যেতে খুব জ্যাম পেরতে হয়েছে জামসেদকে।
ডায়মন্ডহারবার রোড জ্যাম। অনেক রকম গাড়ি। সব মিলিয়ে কেমন যেন এ
জড়ামরি ব্যাপার। 'ফিয়াট' 'অ্যামবেসাডার'-এর তুলনায় ছোট, তবু তো সারবন্দি গ
ভিড়ে আটকে যেতে হয়। সময় কাটে। একটুও এগোন যায় না। এক চাকা এগিয়ে
এগোওনি, দাঁড়িয়ে পড়। একরাশ বিরক্তি জড়িয়ে ধরে ক্রমশ।

নানাভাই বেশি কথা বলল না। একটা দুটো। অনেক কথা বলার পর একটা
জবাব পাওয়া গেল। তাও খুব সংক্ষেপে। অনেকক্ষণ পর নানাভাই বলল, তে
আমায় মিলে এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে আমাদের মাসের রোজগারটা
থাকে। খুব খরচা চলছে রোজি, নওরোজিদের। প্রচুর টাকা। বলতে বলতে নান
চুপ করল।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকাল নটার রোদ ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপা
এখনও ছত্রী সৈন্য হয়ে নেমে পড়েনি। সকাল থেকে বৃষ্টি হলেও গরম কিন্তু কমে
হিউমিডিটি খুব বেশি. ভাবতে ভাবতে কেবিনের ভেতর বসে ছোট তোয়ালেতে
মুখ মুছলেন জামসেদ।

কেমন আছ নানাভাই?

মোটামুটি।

কেন, মোটামুটি কেন?

জামসেদের এই কথায় কোনো উত্তর নেই।
সময় চলে যাচ্ছে। মাথার কাছে খোলা জানলার বাইরে খানিকটা এবড়ো-খেবড়ো মির পর সেই বিশাল ছায়াল বটগাছটি। তার গায়ে, পাতায়, শিকড় হয়ে নেমে আসা ওর দাগ।
নার্স এসে চাবি দিয়ে লোহার খাটটাকে খানিকটা তুলে দিয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ াজা হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে এভাবে খানিকটা অন্যরকম করে দিলে পিঠটা আরাম য়। ক্যাথিটা লাগান আছে এখনও! একটা চাদর দিয়ে দেব কি না, জিগ্যেস করাতে ড় নাড়ল নানাভাই। —লাগবে না।
একটু পরেই রোজি এল।
রঙ মিলিয়ে ম্যাচ করে পরা সুন্দর শালোয়ার-কামিজ। তেমনই দোপাট্টা।
ক্ষণ এসেছ আঙ্কল? রোজির কথার সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে কবিনের বাতাসে।
হবে চল্লিশ মিনিট। কি বড় জোর ফর্টিফাইভ মিনিটস।
াবার্তা বলেছে বাবা?
মন আর কই! চুপ করেই তো থাকে।
ই এক অসুবিধে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আঙ্কল?
না, ঠিকই আছে। পুরনো বন্ধু আমাদের। একা একা এলিয়েনেটেড ফিল করে। ালি। অত ফুর্তিবাজ মানুষ। সব রকম আড্ডার মধ্যমণি। তার এই অবস্থা! দেখে হয়।
কি করবে বল আঙ্কল। আমরাও তো মেনে নিয়েছি।
হয়ত তোমাদের বাবাও মেনে নিয়েছেন।
তাই মনে হয়।
তুমি কি চেম্বার সেরে এলে?
হ্যাঁ, তাই এলাম। তবে আজ তেমন কোনো ভিড় ছিল না।
তাই! বলেই জামসেদের মনে পড়ল, রোজি হার্ট স্পেশালিস্ট তাই, কোনো সার্জন গাইনির এক্সপার্ট—গায়নোকোলজিস্ট হলে নির্ঘাৎ বলত, আজ তেমন কোনো কেস ল না।
কেমন আছ বাবা? রোজি জানতে চাইল।
প্রথমটায় তেমন কোনো জবাব ফুটে উঠল না নানাভাইয়ের গলায়।
কি গো বাবা, চুপ কেন! রাগ হয়েছে?
এবারও কোনো উত্তর নেই নানাভাইয়ের ঠোঁটে।
কি বাবা, রাগ হয়েছে আমার ওপর।
এবারও কথা বলল না নানাভাই।

খাটের কাছাকাছি চলে আসতেই নানাভাই তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল রোজি
দিকে। হাতের ভেতর হাত রাখল রোজি। তারপর বলল, আজ নওরোজি আসবে।

আমি ঢোকার পরও ডান হাত বাড়িয়ে দিয়েছে নানাভাই। আমি এগিয়ে গিয়ে ত
হাতের ভেতর হাত রেখেছি। বেশ জোর আছে এখনও নানাভাইয়ের। মনে পড়ে গে
জামসেদের।

কই দেখি, দাও। দাওতো দেখি তোমার বাঁহাত। বের কর। দাও আমার হাতে-
বলে বাবার ডান হাতের ভেতর নিজের ডান হাত বসিয়ে দিল রোজি। বাঁহাত দি
নিজের বড় মেয়ের ডান হাত চেপে ধরতে ধরতে নানাভাইয়ের চোখে জল এল।

রোজি এলেই নার্সটি এসে দাঁড়িয়ে যায়।

ডাক্তারবাবুরা এসেছিলেন রাউন্ডে?

হ্যাঁ, সকালে এসেছিলেন।

একটু মুভমেন্ট করাবেন। হাঁটাতে হবে।

উঠতেই চান না।

একটু একটু করে ওঠাতে তো হবেই। দাঁড় করাতে হবে নিজের পায়ে। হাঁটাবে
ডাক্তারবাবুরা বার বার বলছেন। এর মধ্যে বেডসোর যদি হয়ে যায়, তাহলে আপনার
গেছেন, আমরাও গেছি।

উনি তো হাঁটতেই চান না।

হাঁটাতে হবে। দরকারে জোর করবেন। না হলে বেডসোর হয়ে যেতে পারে, ি
মতো ব্লাড সার্কুলেশান না হলে—জামসেদ দেখলেন ঘরের ভেতর রোজির ক
শুনতে শুনতে নার্সটি মাথা নিচু করে আছেন।

বাবা, ও বাবা! অনেক কষ্টে যেন চোখ খুলল নানাভাই।

ঘুম পেয়েছে?

নানাভাই কোনো উত্তর দিল না। আবার চোখ বুজল।

একটু পরেই কেমোথেরাপি করাতে নিয়ে যাবে। হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে ব
রোজি।

তাহলে আমি চলে যাই এবার? জামসেদ জানত চাইলেন।

যাবে? আচ্ছা। খুব কষ্ট দিচ্ছি তোমায় আঙ্কল। অন্যায় আবদার। সকালে অ
এখানে—অতদূর থেকে।

অমন করে বলছ কেন ডিয়ার! আমি তো বলেইছি তোমায়, নানাভাইয়ের ব্যাপ
যখন যা দরকার হবে, তুমি বলবে। তোমাদের বাবা নানাভাই ঠিকই। কিন্তু সে
আমাদেরও বন্ধু। অনেক দিন রাত কাটিয়েছি এক সঙ্গে। কত, কত আনন্দ আর দুঃ
সব মুহূর্ত। কত ফেনা জীবনের—এক সঙ্গে এনজয় করেছি। এখন সেই লোক
হাসপাতালে শুয়ে, আমি আসব না! কি বলছ তুমি বেবি!

বেশিরভাগ লোকই তো আসে না আঙ্কল। নইলে এমনিতে বাবার বন্ধু তো

য়। সবাই বন্ধু বাবার। এক সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকা। আনন্দ করা। খাওয়া-দাওয়া, ড্রিংকস। আড্ডা। কথার ফুলঝুরি। সেই সব 'বন্ধু'রা তো ফোনে একটা খোঁজ অব্দি নেয় না। কি বলব বল তো!

দুঃখ কর না বেবি। পৃথিবীই এরকম।

না আঙ্কল, তবু তুমি আস, বাবা খুব খুশি হয়।

সে তো আমি বুঝি ডিয়ার। আরও বেশি বেশি আসা উচিত আমার। আমাদের। কিন্তু আমি পেরে উঠি না।

যথেষ্ট আস। আবার কি করবে!

আমি তা-লে আজ এগোই বেবি!

ও সার্টেনলি।

ওকে। বায়।

বায়। সি ইউ এগেইন।

ওহো—এক মিনিট। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, এটুকু বলে জামসেদ ফিরে এলেন।

কি কথা গো?

তোমার —ল'য়ার কাকা—বাবুভাই মোদির খবর কি? খবর দিয়েছিলে তুমি?

না আঙ্কল। এখনও সব গুছিয়ে উঠতে পারিনি।

রিপোর্টগুলো যত তাড়াতাড়ি পার পাঠিয়ে দাও। বাবুভাই নিজে থেকে যখন দায়িত্ব নিয়েছে।

হ্যাঁ আঙ্কল। দিয়ে দেব।

দেরি কর না ডিয়ার। দেরি কর না।

বলতে বলতে কালো টেরিকট প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে সামনে হেঁটে যেতে যেতে জামসেদ দেখতে পেলেন বাঁ-দিকে পুকুরের জলে সেই সব সারবন্দি রাজহাঁসেরা। খুব আস্তে আস্তে সাঁতার দিচ্ছে তারা। তাদের ছায়া কাঁপতে কাঁপতে ভেসে আছে জলের ওপর।

ফিয়াটের স্টিয়ারিংয়ে পাক দিতে দিতে জামসেদ দেখতে পেলেন তাঁর দুপাশ দিয়েই কলকাতা বড় দ্রুত ছুটছে। এই ছোটা—ইঁদুর দৌড়ের কোনো শেষ নেই। আর এর শেষ যে কোথায় হবে, কেই জানে না। সবাই ছুটছে। সকলে। তাদের কারও সামনে গাজর হিসেবে ঝোলান আছে টাকার থলি, কারও বা নামের মোহ। এত ছুটে শেষ অব্দি সবাই এক সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়বে না তো!

ভাবতে ভাবতে আবারও স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দিলেন জামসেদ। আকাশ মেঘে মেঘে ভারী হয়ে আছে। যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বৃষ্টি হয়ে। তবে রাস্তায় বৃষ্টি না আসাই ভালো। অবধারিত ওয়াটার লগিং। জ্যাম। জল ঠেলে ঠেলে বাড়ি ফেরা। একটু বর্ষা হলেই তো কলকাতা এখন পুকুর।

এরকম ভাবে মেঘ করে থাকলে গরম বাড়ে। ঘাম হয়। সঙ্গে কষ্ট।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জ্যাম কাটাতে কাটাতে জামসেদ আবারও তাঁর গাড়ি আয়নায় একটি টাটা সুমো ভেসে উঠতে দেখলেন। তেমনই মেরুন রঙ। তাহলে কি সেদিনের মতো! ভাবতে ভাবতে আয়নায় চোখ রাখলেন জামসেদ। তবে কি আবার অনুসরণ করছে তাঁকে ভাইয়ের গ্যাংয়ের বন্দুকবাজেরা। কিংবা ভাই ছাড়া অন্য যা ওয়াদিয়া ম্যানসনে সমেত তাঁর সাত কাঠা জমি কিনে নিয়ে তাঁকে এই শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়, তাদের কেউ!

টাটা সুমো একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে চলছে। চলছে। চলতে চলতে হঠাৎ স্পি তুলল সেই মেরুন রঙের টাটা সুমো। তারপর হঠাৎই তাঁর 'ফিয়াট' টাকে একটু টোকা নয়ত ধাক্কা দিতে চেয়ে একদম পাশ ঘেঁষে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভেতর। এত দিনের গাড়ি চালান পাকা হাত, একটু কি নড়ে গেল কোনোভাবে? ফুটপাথের অনেকটা ধারে—বলতে গেলে একটা চাকা প্রায় উঠে গেল ফুটপাথে। এ অবস্থায় গাড়ি সমেত নিজেকে অ্যাকসিডেন্ট থেকে বাঁচালেন জামসেদ।

এবারও ভাগ্য সহায়, না গাড়িতে না তাঁর গায়ে, কোথাও কোনো আঁচড় লাগেনি। অত বড় গাড়ি, যুদ্ধের ট্যাঙ্ক হয়ে যদি লাফিয়ে পড়ত ঘাড়ের ওপর, তাহলেই তো সব শেষ। এমন ভাবতে ভাবতে গাড়ির কাচ তুলে দিলেন জামসেদ। আর তখনই উল্টো দিকে থেকে উড়ে এল এক শাদা মারুতি। প্রায় তাঁর মুখোমুখি।

তারপরই সাইকেলের টায়ার ফাটার শব্দ। পর পর দুবার।

গাড়ির সামনের কাচ ঝন ঝন—ঝনন করে ভেঙে পড়ল। আর বহুদিনের অভ্যাসে অভ্যস্ত রিফ্লেক্সে অনেকটা মাথা নামিয়ে নিলেন জামসেদ।

গুলি দুটো তাঁর গায়ে বা মাথায় লাগল না। কিন্তু হাত কেঁপে যাওয়াতে স্টিয়ারিং সমেত গাড়ি থর থর থর থর করতে করতে উঠে এল ফুটপাথে। স্টিয়ারিং ব্রেক—সবই প্রাণপণে কনট্রোল করার চেষ্টা করলেন জামসেদ। ভাগ্যিস জায়গাটা খুব ভিড়-ভাড়াক্কার নয়। কনজেস্টেড হলে আর দেখতে হত না। নির্ঘাৎ মারা যেত দু-তিন জন কিংবা গুরুতর আহত। একটা মারও মাটিতে পড়ত না তখন। বয়স্ক বলে তাঁকে রেয়াত করত না কলকাতার পাবলিক।

ভাগ্যিস জায়গাটা বেহালা চৌরাস্তার অনেক, অনেক আগে।

ফুটপাথের ওপর গাড়ি তুলে দিয়ে ঘেমে নেয়ে যাওয়া জামসেদ দেখতে পেলেন তাঁর সামনের উইন্ড স্ক্রিন—একেবারে তিতর-বিতর, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ভাঙা কাচ ছড়িয়ে আছে সিটময়। দু-একটা টুকরো ছিটকে এসে বিঁধে গেছে হাতে, বাহুতে, কবজির পাশে। সেখানে থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের গলান সুতো, ঘামের নুনটুকু চিড় বিড়ানি বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই কাটা জায়গায়। তাঁর গাড়ি ঘিরে ভিড় জমে গেছে তারমধ্যে আছে একজন ট্রাফিক পুলিশও।

সামনের দরজা খুলে ফুটপাথে পা রাখলেন জামসেদ। তখনও তাঁর হাত-পা অল্প অল্প কাঁপছে। গায়ের বুক কাটা হাফ হাতা কটন শার্ট, তার নিচের গেঞ্জি—সব ঘামে ভিজে একসা। ফুটপাথে নেমে গাড়ির কাচ তুলে লক করলেন জামসেদ।

তারপর একটা ওষুধের দোকান—মেডিকেল শপের জন্যে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন। সামনে—ঠিক সামনে নয়, মিনিট খানেক হাঁটার পর একটা ওষুধের দোকান। সেদিকে যেতে যেতে দেখলেন তাঁর পেছনে, চারপাশে বেশ কিছু উৎসাহী লোকজন।

একজন পুলিশ—ট্রাফিক পুলিশই, প্রায় ছুটে এসে বলল, কি ব্যাপার মিস্টার?

পরিষ্কার ইংরেজিতে জবাব দিলেন জামসেদ, সেটা আমি কি করে বলব বলুন?

ইংরেজি শুনে পুলিশও বেশিরভাগ সময় ঘাবড়ায়। জামসেদ জানতেন। এবারও তাই হলো।

আপনি কি কারও টার্গেট?

সে তো আমি জানি না। আপনারা বলতে পারবেন।

তাহলে গুলি করল কেন আপনাকে? কোনো পুরনো রাইভ্যালরি?

সে রকম কোনো কিছু আমার অন্তত জানা নেই।

কিন্তু থানায় একটা ডায়েরি করা দরকার আপনার।

সে তো ভাবছি করব। কিন্তু তার আগে ফার্স্ট এইড নিতে হবে। টেডভ্যাক ইনজেকশানও সঙ্গে একটা। তার জন্যে মেডিকেল শপ খুঁজছি।

সামনেই তো আছে। চলুন। ট্রাফিক পুলিশটি সঙ্গ ছাড়ছে না জামসেদের।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল, ইনসিওরেনস করা আছে গাড়ি?

সে দিকে মন দিলেন না জামসেদ।

মেডিকেল শপের সাইনবোর্ডটি দেখে তিনি এগোতে শুরু করেছিলেন। দোকানের সামনে তিনি থামলেন। তারপর আস্তে আস্তে ঢুকে গেলেন ওষুধের দোকানের ভেতর।

ট্রাফিক পুলিশটি ও তাঁর সঙ্গে আসা ভিড়ের খানিকটা দাঁড়িয়ে পড়ল ফুটপাথে।

ওষুধের দোকানে তেমন ভিড় নেই। কাউন্টারে দাঁড়ান মাঝবয়েসি লোকটি জানতে চাইল, আপনার—

একটা টেডভ্যাক নেব। আর কাটা জায়গায় একটু মারকিউরোক্রম দিতে হবে—বলতে বলতে ডান দিকের কোমরে গুলি ভর্তি কোল্ট-এর ঠাণ্ডা অস্তিত্ব টের পেলেন জামসেদ।

থানার বাইরে একটা মাঝারি মাপের ভিড় ঘিরে আছে জামসেদকে। সেদিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। কাটা জায়গায় মারকিউরোক্রোম দেয়ার পর ভোঁতা ব্যথার ওপর কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়েছে। তবু অস্বস্তি আছে এক রকমের।

নিয়ম মতো থানায় একটা ডায়েরি করাতেই হবে। এখানেই ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি কাজ করে। সেই এক কথা বল, পুরনো রাইভ্যালরি আছে কিনা! কোনো

গোপন শত্রুতা! যদি থেকে থাকে, তাহলে কি নিয়ে? প্রপার্টি, উয়োম্যান, ব্যবসা, না
আর কিছু?

ভেবে ভেবে জবাব দিতে হবে. কাউকে সন্দেহ হয় কিনা। সন্দেহ হলে কেন হয়
কি কারণে। কোনো পুরনো শত্রুতা ছিল কি না, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন
তাদের কাউকে সাসপিসাস বা ফিশি মনে হয় কিনা—এমন প্রশ্ন অনবরত। এমন
এরুচশা আননোন গানমেনদের গুলিতে মারা যাওয়ার পর এরকম অনেক প্রশ্ন উঠ
নিয়মিত। লোকাল থানা থেকে ইউনিফর্ম পরা অফিসার আসেন। যেখানে খুন হয়ে
এরুচশা—স্পট অফ অকারেন্স, সেখান থেকেও—মানে সেই এলাকা যে থানা
আনডারে পড়ে, সেখান থেকেও প্লেন ড্রেসে—শাদা পোশাকের পুলিশ আসে
অফিসার। কনস্টেবল। এই মামলার যিনি আই ও—তিনি আমায় নানাভাবে বহু কথ
জিগ্যেস করেন। একবার নয়, বারবার আসেন তিনি। তারপর লালবাজার থেকে
আই বি-র লোকজন—তাঁরাও প্লেন ড্রেসে। জেরায় জেরায় একেবারে জেরবা
অবস্থা।

শোক করব কি! খালি প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে দিন কাটে। আর ওঁদের আসা
টাইমেরও কোনো ঠিক নেই। যখন তখন চলে আসেন। সে এক ব্যতিব্যস্ত অবস্থা
আমার থেকে সরস্বতীর অবস্থা আরও করুণ। ওঁরা চা খাবেন কিনা, এটা জানার জ
বার বার আসতে হয় বেচারিকে।

বেশিরভাগ সময়েই ওঁরা চা খাননি। কিন্তু প্রশ্নবাণে প্রশ্নবাণে আমি একেবা
ঝালাপালা। সঙ্গে বাড়ির কাজের লোকেরাও।

থানায় ঢুকেই ডানদিকে মালখানা। তারপরই পরপর দুটো লক-আপ—সেখা
অ্যারেসটেড পার্সনসরা থাকে। একটায় জেনটস অন্যটায় লেডিজ। মালখানার বাই
দরজার ফ্রেমে—কপালের ওপর যাকে বলা যেতে পারে, সেখানে ইংরেজি অক্ষ
সাজিয়ে সাজিয়ে ' মালখানা' কথাটি লেখা।

লক-আপের মেঝেতে জলের দাগ। এক কোণে একটা লাল রঙের মাটির কুজো
তার মুখে উপুড় করে রাখা নীল পলিথিনের গ্লাস। সময়ের ধোপে সেই নীল বে
খানিকটা ফিকে। লাল কুজো ঘিরে কয়েকটা কালচে মাছি।

লেডিজ লক-আপে একজন। জেনটস-এ জনা চার পাঁচ। মোটা মোটা লোহা
শিকের পাল্লায় বাইরে থেকে হুড়কো টানা। বড় একটা তালা ঝুলছে। মালখানা
দরজায় টানা হুড়কোর গায়ে একটা হ্যান্ডকাপ। হয়ত বা তালার বদলে।

মালখানার মতোই লেডিজ আর জেনটস লক-আপের দরজার ফ্রেমে, কপালে
ওপর ইংরেজিতে 'লেডিজ' আর 'জেনটস'—এই শব্দ দুটো লেখা। লালের ওপ
শাদায়। মালখানাতেও রঙের একই কমবিনেশন।

ভেতরে ঢুকে আসার পর মালখানা আর লক-আপদের উল্টোদিকে ঘর আছে। অ
লক-আপের পরই কাঠের লম্বা টেবিল। টেবিলের ওপর কাচ পাতা। জল রঙা কাচে

নিচে জিভ বের করা কালির ছবি। লোকনাথ ব্রহ্মচারী। সারা বছরের ডেট ক্যালেন্ডার। অনেক অনেক ভিজিটিং কার্ড। ফোন নম্বর, নাম লেখা টুকরো কাগজ।

মাঝবয়েসি অফিসারটি মাথা নিচু করে বড় জাবদা মতো খাতায় ডট পেনে কি যেন লিখে যাচ্ছে মন দিয়ে। পরপর তিনটে চেয়ার। একটা ফাঁকা।

টেবিলের ওপারে, চেয়ারের উল্টোদিকে লম্বা বেঞ্চ। সেখানেও কিছু লোকজন।

মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু তাতে গরম কমে না। কপাল, ঘাড়ের ঘাম পকেট থেকে ছোট তোয়ালে-রুমাল এনে মুছতে মুছতে জামসেদ দেখতে পেলেন মন দিয়ে লিখে যাওয়া এ এস আই-টির মাথার ওপর করালবদনা কালি। ফ্রেম-কাচে বাঁধান ক্যালেন্ডারের ছবি। সেই ছবির কাচে সময়ের ধুলো। ঝুল। একটা পেটমোটা টিকটিকি ছবির পেছন থেকে মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে।

হাতের ঘড়ি দেখলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। একটা দশ। মারকিউরোক্রোম দেয়া জায়গাগুলো এখনও অস্বস্তি তৈরি করছে একটু একটু।

বলুন। খাতা লেখা অফিসারের পাশে বসা আর একজন খাকি ইউনিফর্ম বলে উঠল।

একটা জি ডি করব।

কি ব্যাপারে?

একটা অ্যাটাক হয়েছে। আননোন গানমেন। টাটা সুমো নিয়ে আমার গাড়িটাকে ঠেলে ফুটপাথের ওপর তুলে দিয়ে—

কি গাড়ি আপনার? নিজেই চালাচ্ছিলেন?

ফিয়াট। হ্যাঁ।

নম্বর?

জামসেদ তাঁর গাড়ির নম্বর বললেন।

অ।

টাটা সুমো থেকেই কি অ্যাটাকটা হলো?

নাহ্। উল্টোদিক থেকে একটা শাদা মারুতি—সেখান থেকেই ফায়ার করল।

টাটা সুমোর নম্বর নিয়েছেন?

না।

মারুতির?

না।

দেন্! তাহলে কি হবে? কলকাতায় কত কত শাদা মারুতি। আপনারা কেন যে নম্বর দিতে পারেন না! গাড়ির নম্বর না দিলে পুলিশ কি করবে! এগোবে কি ভাবে? প্লেস অফ অকারেন্সে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ কি নোট করেছেন নম্বর?

নোট করে কি হবে! ওতো ফলস হবে। নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করলেই—জামসেদ

ওয়াদিয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানার ভেতরে আসা তিন-চারজনের ভেতর কে একজন যে
এসব বলে উঠল।

চুপ করুন তো। সব জেনে গেছেন। সবজান্তা সজারু একেবারে—ধমকে উঠ
চেয়ারে বসা খাকি ইউনিফর্ম।

মোটা খাতায় মাথা নিচু করে মন দিয়ে কি কি সব লেখা আর এক খাকি ইউনিফ
বেশ একটু জোর গলাতেই বলে উঠল, কি হচ্ছে কি দাস! ভেতরে এত ভিড় কেন
এই, কি চাই আপনাদের?

এঁকে গুলি করা হয়েছে রাস্তার ওপর। ব্রড ডে লাইটে। দিনে দুপুরে গুলি ক
পালিয়ে গেল ক্রিমিনালরা।

আপনারা দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখলাম।

কি দেখলেন? দাস জানতে চাইল।

একটা টাটা সুমো—মেরুন রঙের।

তুমি চুপ কর দাস। আমি দেখছি। বলে আর এক খাকি ইউনিফর্ম তার লে
থামিয়ে জিগ্যেস করল, শুধু মেরুন টাটা সুমো! আর কিছু না?

হ্যাঁ, একটা শাদা মারুতিও ছিল।

কি হচ্ছে কি বিশ্বাস! একই কথা রিপিট হয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে দাস তার মাথ
পাতলা হয়ে আসা চুলে আলতো করে বাঁ হাতের আঙুল ছোঁয়াল।

মারুতির নম্বর নিতে পেরেছেন? জানতে চাইল বিশ্বাস।

না।

টাটা সুমোর নম্বর?

না।

তাহলে ঘটনাটা কি হলো? দাস জানতে চাইল।

আমি বলি একটু—জামসেদ ওয়াদিয়া বলে উঠলেন।

বলুন।

আমি একটা জি ডি করব।

করবেন।

আমার ওপর কিছু আননোন গান মেন গুলি চালিয়েছে।

অ্যাঁ! বলেন কি? দাস বলে উঠল।

ইয়েস। রাউন্ড অ্যাবাউট টুয়েলভ থারটি—বেলা সাড়ে বারোটা হবে প্রায়, আ
ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতাল থেকে আমার ফিয়াট-এ আসছিলাম।

সিট ডাউন প্লিজ। আপনি বসুন। প্লিজ। বিশ্বাস বসতে বলল জামসেদকে।

ওকে। ঠিক আছে।

এই যে আপনারা একটু সরে সরে যান। বসতে দিন ওঁকে। বিশ্বাস একটু চেঁচিয়ে

বলে উঠল। ঠিক তখনই দেয়ালে টাঙান কালির ছবির পেছন থেকে টিক টিক টিক টিক করে ডেকে উঠল স্বাস্থ্যবান টিকটিকি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক-আপ খোলার শব্দ হলো। ঘটাং। ঠং। আরও জনা দুইকে জেনটস লক-আপের ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিল পুলিশ।

ঘটাং—ঠং শব্দে বন্ধও হলো লক-আপের দরজা।

বলুন—দাস তাড়া দিল জামসেদ ওয়াদিয়াকে। তার কথা শেষ হলো না। কড় রং কড় রং—কড় রং কড় রং করতে করতে ডেকে উঠল টেলিফোন।

বিশ্বাস যেখানে বসে বসে মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছিল, সেখান থেকে একটু উঁচুতে ঢালাই করা তাকের মতো একটা জায়গায় টেলিফোন বেজে যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ বাজার পরই বিশ্বাস ফোন তুলে বলে উঠল—ইয়েস—বেহালা পি এস। স্পিকিং। না—না— না—নট অ্যাট অল। এরকম কোনো ইনফরমেশন আমাদের কাছে নেই। না। না। বলছি তো-আদপেই কিছু নয়। না, না—কেন বিরক্ত করছেন! সে রকম কোনো ইনফরমেশন থাকলে আমরা বলব না কেন? বলেই ঘড়াং করে রিসিভার রেখে দিল বিশ্বাস।

জোটেও সব আমার কপালে। কালো রঙের সাবেক ডিজাইনের রিসিভার নামিয়ে গজ গজ করে উঠল বিশ্বাস।

আর তখনই আবারও কড় রং কড় রং করে বেজে উঠল টেলিফোন।

ওফ! আর পারা যায় না। ফোনের পর ফোন। ফোনের পর ফোন। একটু যে শান্তিতে কাজ করব তার উপায় নেই।

কালো রিসিভার তুলে বলে উঠল বিশ্বাস, ইয়েস—বেহালা পি এস। ইয়েস। স্পিকিং সার। সার। বলতে বলতে দাঁড়িয়ে পড়ল বিশ্বাস।

জামসেদ দেখতে পেল 'সার, সার' করতে উঠে দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম হাতে করে কাচিয়ে নিল বিশ্বাস। —সার। ইয়েস সার। সার। ওকে সার। সার। অলরাইট সার। সার—বলেই ফোন নামিয়ে বলল বিশ্বাস, এখনই ফোর্স রেডি করতে হবে। হেড কোয়ার্টার্স থেকে খবর আছে মোস্ট ওয়ানটেড টেররিস্ট চার পাঁচ জন—বলেই চুপ করে গেল বিশ্বাস। তারপর একটু হেসে কোমরের বেলট ঠিক করতে করতে বিশ্বাস বলল, দাস, মিস্টার ওয়াদিয়াকে কুইক ছেড়ে দাও। আমাদের সামনে এখন একটা বড় কাজ। কমাণ্ডোরা ঘিরে ফেলে ফায়ারিং শুরু করে দিয়েছে। আমরা শুধু একটু কভারিংয়ে থাকব ফোর্স নিয়ে। যাতে রাস্তা পেরিয়ে পালাতে না পারে।

কোর্টে আর কি কেউ যাবে আজ?

না, না—যারা যাবার তারা তো সকাল দশটার মধ্যে প্রিজন ভ্যানে রওনা হয়ে গেছে। বলেই দাস সামনে চালান বই নিয়ে দাঁড়ান কনস্টেবলটির দিকে তাকাল। তারপরই আগের কথার সুতো টেনে বলল, না, না—আজ আর কেউ যাবে না কোর্টে।

তা হলে যে কজন লক-আপে আছে, তাদের দুপুরের খাবার হোটেলে বলে দি
সার?

বলে দিন। বলে দিন। বলতে বলতে দাস বলল, হ্যাঁ—বলুন মিস্টার ওয়াদিয়া। সরি
একটু দেরি হয়ে গেল। নাও ক্যারি অন। বলুন আপনি।

কি বলব? জানতে চেয়ে তোয়ালে-রুমালে মুখ, ঘাড়, গলার ঘাম মুছলেন
জামসেদ।

ঐ যে জি ডি নেব।

হ্যাঁ—আমার বন্ধু নানাভাই মোদি ক্যানসার পেশেন্ট। এখন ভর্তি আছে ঠাকুরপুকুর
ক্যানসার হাসপাতালে। তাকে দেখে ঠাকুরপুকুর থেকে ফেরার পথে ডায়মন্ডহারবার
রোডের ওপর আমার ফিয়াটকে ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরে প্রায় ফুটপাথের ওপর তুলে
দিল মেরুন রঙের টাটা সুমো। সেটা বেহালা চৌরাস্তার অনেকটা আগে।

ফুটপাথ কি ফাঁকা ছিল?

হ্যাঁ, মোটামুটি।

ক জন ছিল সুমোয়?

লক্ষ করি নি।

তারপর কি হলো? জানতে চাইল দাস।

উল্টো দিক থেকে একটা শাদা রঙের মারুতি—

কি মারুতি! মারুতি ভ্যান, না মারুতি কার?

মারুতি ভ্যান।

তারপর কি হলো মিস্টার ওয়াদিয়া? জানতে চেয়ে বাঁ হাতে কপালের ঘাম কাচিয়ে
নিল দাস।

তারপর আবার কি? পর পর দুটো গুলি।

দুটো গুলি কি করে বুঝলেন?—উফ, যা গরম! বলেই দাস আবারও জানতে চাইল
তাহলে এবার বলুন, আপনাকে যে দুটো গুলিই করা হয়েছে, কেমন করে বুঝতে
পারলেন?

শব্দ শুনলাম।

বেঁচে গেলেন কি করে?

ভাগ্যিস সহজাত রিফ্লেকসে মাথা নিচু করেছিলাম, তাই—

এতো সিনেমায়, গল্প-উপন্যাসে হয় মশাই।

টিভি সিরিয়ালেও হয়। বলে শব্দ না করে হাসলেন জামসেদ। তারপর বললেন
কিন্তু ভাঙা কাচ ফাচ ছিটকে এসে খানিকটা খানিকটা বিঁধে গেছে গায়ে। হাতে। এখনও
তার জ্বালা, ব্যথা টের পাচ্ছি।

এসব শুনে গড় গড় করে লিখে যাচ্ছে দাস।

কেন হলো আপনার ওপর অ্যাটাক? লিখতে লিখতেই প্রশ্ন করল দাস।

সেটা আমি কি করে বলব?

আপনি জানেন না!

না, সেভাবে তো জানি না।

কিন্তু অ্যাটাকটা তো হলো।

হলো তো।

সেটা কেন হলো? আপনার কি মনে হয়!

দেখুন, আমার একটা তিন তলা বাড়ি আছে। সঙ্গে সাত কাঠা জমি। আমার ঠাকুরদার তৈরি।

কোথায় এটা? জানতে চাইল দাস।

ওটা ইস্ট ক্যালকাটায়। পার্ক সার্কাসে।

পি এস?

বেনিয়াপুকুর।

সে তো বিশাল প্রাপার্টি মশাই। কয়েক লক্ষ—লক্ষ কেন, কোটি টাকার প্রপার্টি—তারপর বলুন।

আমায় বেশ কয়েক মাস ধরেই ফোনে থ্রেট করছে।

কে থ্রেট করে?

আননোন ভয়েস।

কিছুই জানেন না আপনি এ ব্যাপারে?

এটুকু জানি যে, না-জানা কণ্ঠস্বর আমায় ভাই বলে এক জনের নামে হুমকি দেয়। ওহাল প্রপার্টিটা কিনে নিতে চায় ভাই। সে আমার ঠাকুরদা জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়ার তৈরি করা ওয়াদিয়া ম্যানসন ভেঙে মালটি স্টোরিড করবে। হাই রাইজ। সেখানে অনেকগুলো পারিবারকে বসাবে। এখন তো রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা হয় কোটি কোটি কোটি টাকার। টাকা তো উড়ছে হাওয়ায়। তাকে ধরে নিতে হবে কেবল। ধরে ফেলেই পুরতে হবে পকেটে।

এসব আপনি জানিয়েছেন পুলিশকে?

সব।

জানিয়েছেন?

হ্যাঁ, বললাম তো!

কোনো রেজাল্ট?

ধমকি দিয়ে ফোন আসা তো বন্ধ হয় নি। এর বেশি রেজাল্ট কি হয়েছে বলতে পারব না।

আমি ডায়েরি নিচ্ছি—কিন্তু—বলতে বলতে দাস মাথা নিচু করে লিখতে লাগল।

ভাগ্যিস এরুচশার গুলিতে মৃত্যুর কথা বলিনি—তাহলে আবার জিজ্ঞাসা। একগাদা প্রশ্ন। মনে মনে ভেবে নিয়ে জামসেদ চুপ করে রইলেন।

বাড়িতে কে কে আছে আপনার? ঘাড় নামিয়েই প্রশ্ন করল দাস। তারপর বাঁ হাতে কপালে জমা ঘাম চেঁছে ফেলল।

নিজের বলতে কেউ নেই।

কেন?

কেন আবার কি! স্ত্রী মারা গেছেন। দুই ছেলেও।

ইস। স্যাড। ভেরি স্যাড। বলতে বলতে মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল দাস।

জিগ্যেস করতে খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু তবুও জানতে চাইছি স্ত্রী মারা গেছে কবে?

এই তো বেশি দিন হয় নি। এক বছরও হবে না।

নর্মাল ডেথ?

এটা জানতে চাইছেন কেন?

এমনিই—কৌতূহলে। বলেই মাথা তুলে হালকা করে হাসল দাস।

না, অ্যাবনর্মাল।

সুইসাইড, অর হোমিসাইড?

মার্ডার। বলেই আবারও তোয়ালে-রুমালে মুখ মুছতে গিয়ে ঘামের ভ্যাপসা গন্ধ টের পেলেন জামসেদ ওয়াদিয়া।

মার্ডার?

হ্যাঁ মার্ডার। আননোন গান মেনরা তাকে গুলি করে মেরে দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না আমরা। বলতে বলতে সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল জামসেদের।—ফোনে থ্রেটনিং অবশ্য এরুচশাকে গুলি করার আগে থেকেই রেগুলার হত। তেমন গ্রাহ্য করি নি। এটুকু বলে জামসেদ থামলেন।

কিছু মনে করবেন না, এত খুঁটিয়ে জানতে চাইছি বলে। আসলে আমাদের প্রফেশানটাই এ রকম। সন্দেহ করা। সবাইকে সন্দেহ করা। কেউ আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাইরে থাকেন না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আর আপনার দুই ছেলে?

তাদের একজন কার অ্যাকসিডেন্টে। আর একজন ভুজের ভূমিকম্পে—স্বামী স্ত্রী—দুজনেই চলে গেল। বলতে গিয়ে আবেগে গলার ভেতর খানিকটা মেঘ জমে উঠল জামসেদের। এরুচশা, দুই ছেলে—সবার মুখ পর পর যেন ভেসে উঠল চোখের সামনে। গলার ভেতর এমন মেঘলা জমে উঠলে চোখে বৃষ্টি নামতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন জামসেদ।

কিছু মনে করবেন না সার। আমি হয়ত বা নিজের অজানতেই আপনার একটা গোপন উনড-এ খোঁচা দিয়ে ফেলেছি। সরি সার। যাক, বাই দা বাই। প্রসঙ্গটা পাল্টাই তাহলে আপনাকে দেখাশুনো করে কে? আই মিন অত বড় বাড়িতে আপনি একলা

কে আর দেখবে? সরস্বতী আছে। ওর হাজব্যান্ড মাঙ্গেলাল। মাঙ্গেলাল আর সরস্বতীর দুই ছেলে—রাজেশ, সুনীল। ওরা সবাই মিলে আমায় দেখে।

আপনার কোনো রিলেটিভ?

আছে।

কাছাকাছি?

কলকাতায় আছে দু-চার জন। বেশির ভাগই গুজরাট, মুম্বাইয়ে। তবে বন্ধু-বান্ধব াছে অনেক। সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন—নানাভাইকে দেখেই তো ফিরছিলাম াকুরপুকুর ক্যানসার হসপিটাল থেকে। তার মধ্যেই তো—ফেরার রাস্তাতেই এই াপদ। একদম বোলট ফ্রম দ্য ব্লু। দনাদন দনাদন গুলি। বলেই তোয়ালে-রুমালে মুখ াত ঘাড় গলা মুছলেন জামসেদ ওয়াদিয়া।

দাস, আমি কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছি। বড়বাবুও যাচ্ছেন।

ওকে। বলে দাস ঘাড় নাড়ল। তারপর হাতে ঘাম কাচাল কপালের। কাচবার পর সই হাত ছোঁয়াল মাথার পাতলা চুলে।

আমার জি ডি নাম্বার? জানতে চাইলেন জামসেদ।

আপনার জি ডি নম্বর—বলেই জেনারেল ডায়েরি নম্বরটা বলল দাস।

ওকে! থ্যাঙ্ক ইউ। বলেই জামসেদ বুঝতে পারলেন তাঁর পেটের ভেতর মস্ত একটা াঁদের ঝরনা সব বাধা মেনে ছুটতে চাইছে।

থ্যাঙ্ক ইউ।

থানা থেকে বেরনর সময় জামসেদ ওয়াদিয়া দেখতে পেলেন তাঁর সঙ্গে াসিডেন্ট হওয়ার পর যে ভিড় জমেছিল তা থেকে যে ছোট একটা টুকরো থানা অব্দি াসেছিল, তাদের কেউই আশেপাশে নেই।

একলা থানা থেকে বেরতে বেরতে তাঁর মনে হলো এই পৃথিবীতে মানুষ বড় একা। াকদম একা। কোমরে গুলি ভর্তি কোল্ট তেমনই স্থির। থানার সিঁড়ি বেয়ে নামতে ামতে সেই লম্বা শাদা আলখাল্লা পরা মানুষটিকে দেখতে পেলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। ার গালে ঘন কালো দাড়ি। সেই দাড়ি লম্বায় প্রায় বুক ছুঁয়েছে। মাথায় শাদা পাগড়ি ারা তিনি চোখে হাসছিলেন।

হে মহামতি জরথুশত্র—নিজের মনে মনেই প্রায় বিড় বিড় করে উঠলেন জামসেদ। ার তখনই তিনি দেখতে পেলেন কাঠের প্রাচীন নৌকোয় পাল উড়িয়ে দিয়ে হরমুজ ন্দর থেকে অনেক অনেক মাইল সমুদ্র পেরিয়ে ভেসে আসছেন সে যুগের অগ্নি-াপাসকরা! তাঁদের সমবেত হাতের টানে নৌকো এগোচ্ছে ঢেউ ভেঙে ভেঙে।

সেই ইতিহাসের গন্ধমাখা জলযানের মাথায় সিন্ধুসারস। সেই সব পাখিদের ডানায় ুরনো পৃথিবীর নবীন রোদ্দুর। পাল তোলা নৌকোর গা বেয়ে বেয়ে গড়িয়ে নামছে রাদের রঙ। নোনা জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভিজে ওঠা কাঠের গন্ধ মিশে গেছে াতাসে। সেই ভেজা ভেজা গন্ধে অনেক অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায়।

হে মহান জরথুশত্র, আপনি—

সবটা বলা হয়ে উঠল না জামসেদের।

তিনি হাসলেন। তাঁর শাদা পাগড়ির ওপর রোদের চমৎকার ফুলকারি। এই গ্রীষ্ম দিনে, যখন সমস্ত চরাচর শিককাবাব হচ্ছে দারুণ দাবদাহে, তখন কি এক ঠাণ্ডা বাতাস যেন বহে যাচ্ছে জামসেদ ওয়াদিয়ার চারপাশে। সেই হাওয়ায় আশ্চর্য সুগন্ধ।

তাঁর লম্বা কালো দাড়ির ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করছে বেলা দুটোর বাতাস। তিনি তাঁর বাঁ হাতে ধরে আছেন সেই দীর্ঘ আলোময় দণ্ডটি। ডান হাতের তিনটি আঙুল সামান্য ভাঁজ করা। তর্জনীটি তোলা আকাশ পানে।

প্রথম ভাদ্রে কলকাতার আকাশের রঙ ছাইমাখা পালিথিন ব্যাগ যেমন হয় তেমনই। কিন্তু জামসেদ দেখতে পেলেন সেই মানুষটির দ্বিতীয় আঙুলটি আকাশের দিকে তুলতেই সমস্ত নভমণ্ডল নীলকান্তমণি হয়ে গেল।

বালহিকের অগ্নি মন্দিরে আপনাকে আক্রমণ করল সেই ধর্মান্ধ তুরানি। বিড় বিড় করে বলে উঠলেন জামসেদ ওয়াদিয়া। তখন আপনি সাতাত্তর।

জামসেদের কথা শুনে সেই শাদা পাগড়ি শাদা আলখাল্লা হাসলেন।

আপনার ডান হাতের তর্জনীটি আকাশের দিকে তোলা। এর অর্থ তো এই—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। বাঁ হাতের সুদীর্ঘ দণ্ডটি মাজদায়সনা দর্শনের কথা বলে। দণ্ডের মাথায় একটি গোরুর মুখ। গাভী মুণ্ডটি স্মরণ করিয়ে দেয় সুরমায়াহা নামে শিশু সমেত সেই পবিত্র গাভীটির কথা—যার দুধ খেয়ে খেয়ে ছোটবেলায় পুষ্ট হয়েছেন রাজা ও অবতার ফারিদুন।

ফারিদুন বড় হয়ে অত্যাচারী জাহাককে হটিয়ে দেন।

জামসেদ ওয়াদিয়ার কথা শুনে তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। শব্দ না করে হাসলেন শুধু। শাদা পশমে তৈরি তাঁর পাগড়ি, সেই ঢিলেঢালা পোশাকের কোথাও এতটুকু অন্য রঙ নেই। সবটাই ধবধবে।

এই শাদা তো সততা, শুদ্ধতার কথা বলে। মাজদায়সনার—অগ্নি-পূজকদের ধর্মের শুদ্ধ ভাবের কথা ফুটে ওঠে এই রঙে। প্রাচীন ঐর্যানাম, আর্যনাম বা ইরানে এই শ্বেত পোশাকটির নাম ছিল সুফ। আরও অনেক অনেক বছর পর মাজদায়সনার দর্শনকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ইসলাম এসে গেলে—সেই ইসলামের একটি ধারা সুফি মত হিসেবে পৃথিবীতে ছড়ায়।

জামসেদের মনে পড়ল সুফিরা বলেন, আনাল হক—আমিই সে। তাঁরাও এই ধরনের—প্রায় একই ডিজাইনের পশমের পোশাক পরতেন। অনেকে মনে করেন এই সুফ থেকেই সুফি।

গোমুখের দণ্ড হাতে তিনি আবারও শব্দহীন হাসি হেসে উঠলেন। তাঁর সুফের কোমরে বাঁধা কোমরবন্ধ—তার রঙও শাদা, সুফের ওপর ছড়ান শাদা চাদর—সবই কেমন যেন আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলোয় স্নিগ্ধতা আছে। জ্বালা নেই।

থানার সামনে সাগরের নীল ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় াদা ফেনার আনন্দ। সেই আনন্দের দিকে তাকালে মনটা ফিরে যেতে চায় সেই ানেক অনেক বছর আগে। বিশাল বিশাল নৌকো বাওয়ার দিনগুলোতে।

ঢেউ এগিয়ে এগিয়ে আসছে আরও। সেই সাগরজলে পা ভিজে উঠছে জামসেদ ্য়াদিয়ার। নোনা জল চামড়ায় লাগলে খানিকক্ষণ পর চ্যাটচ্যাট করে। কেমন একটা াস্বস্তি যেন একটু একটু করে জড়িয়ে ধরে। যে সব নৌকোয় চড়ে আমাদের ঠাকুরদার াকুরদার ঠাকুরদার তস্য তস্য ঠাকুরদারা রওনা দিয়েছিলেন হরমুজ বন্দর থকে—তাদের গা মুখ দেখতে পাচ্ছি।

বাতাসে নুন মেশান জলে ভেজা কাঠের গন্ধ আবারও ছড়িয়ে পড়ল।

নোনা বাতাসের ছোঁয়া অল্প অল্প টোকা দিচ্ছে জামসেদের গালে। মাথার চুলে। সই নুন হাওয়া জড়িয়ে যাচ্ছে জামসেদের সারা গায়ে। জামায়। চিড়বিড় চিড়বিড় করে ঠছে তাঁর কাটা জায়গাগুলো। সত্যি সমুদ্রের ঢেউ জামসেদকে ভাসিয়ে নিতে চাইল।

সাত

বাড়ি ফেরা মাত্র সরস্বতীর এক গাদা প্রশ্ন।

কেন দেরি হলো ফিরতে।

এভাবে খাওয়া-দাওয়া অনিয়ম করলে শরীর থাকবে! নিজের মনে গজগজ করতে রতে খানিকটা দূরে কিচেনে গ্যাস টেবিলে খাবার গরম করে সরস্বতী। ঠিক তখনই ফানটা বেজে উঠল।

ফোন ধরতেই ওপার থেকে সেই চেনা গলা—কা বে বুঢ়োউ, সবক শিখা কি নায়। িখা না সবক—বলতে বলতে খিট খিট খিট খিট করে হাসে সেই ফোনের ওপার থকে কথা বলা কণ্ঠ।

ইয়ে তো শ্রিফ এক ঝাঁকি হ্যায়/অওর বহুত কুছ বাকি হ্যায়। বলেই আবার খিট খিট খিট খিট করে হেসে রিসিভার ফাটিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—

ইউ বাস্টার্ড—দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বলেন জামসেদ।

কা বে বুঢ়োউ—কাহে কো খিসিয়ায় যাতা হ্যায়! কাহে কো! আব ভি বখত হ্যায় াই কা বাত মানলে। ইয়ে মকান তু ছোড় দে। অওর ছোড়কে নও দো ইগার হো যা। ট যা শালে হিঁয়াসে। নহি তো—

নহি তো কা—কা করে গা তু! ওয়াদিয়ার গলায় তীব্র ঝাঁঝ ফুটে ওঠে।

কেয়া করে গা? কেয়া কিয়া দেখা নহি তু! দেখা না! আজ হি দোপহর মে দেখা। খায়া তুঝকো গোলি মার কে। দেখা না—কেয়া বোলা থা ম্যায় নে। যো বোলা থা হি কিয়া। হাঁ—কহে দিয়া ম্যায় নে। আভি ভি বখত হ্যায় ভাই কা বাত মানলে। ইয়ে তা শ্রিফ এক ওয়ার্নিং থা তেরে লিয়ে। জান সে মারা নহি তুঝকো। শ্রিফ ডরায়া ুঝে। ডরায়া শ্রিফ। অগর তেরে কো আজ হি মারনে কা পিলান থা, তো মার দেতা।

চিটি কি তরা। মচ্ছর, তেলচাট্টা, খটমল কো য্যায়সে মারতা হ্যায় অ্যায়সে হি মার
দেতা। লেকিন ভাই নে তুঝকো মারনা নহি চাহা। অগর ভাই সাচমুচ চাহাতা তো তু
খাললাস। আজ হি খাললাস। লেকিন ভাই নে চাহা নহি।

ইউ স্টপ বাস্টার্ড।

আ বে বুঢ়োউ—ফিন তুনে আংরেজি মে গালি বক রহে হ্যায়। গালি দেনা হ্যায়
তো হিন্দি মে দে। হাঁ—কহে দিয়া ম্যায়নে। তু ভি হিন্দুস্থানী, হম ভি হিন্দুস্থানী—তব
কাহে কো লড়াই ঝগড়না! ভুল যা ইয়ে সব। অওর মকান ভাই কো দে দে। বোল
কবে ব্যয়ঠে গা! ইয়ে জান না মুঝে জরুরী হ্যায়। ভাই কা গুসসা তু নহি জানতা রে।
য়ো তো তেরে কো স্রিফ এক চুহা কে তরা জিন্দা রাখখে হ্যায়।

ইউ স্টপ ইওর বকোয়াস।

আবে বাত তো পুরা করনে দে। তু দেখা না চুহা অওর বিল্লিকা খেল। যব বিল্লি নে
চুহা কো পাকড় লেতে হ্যায়, তব য়ো কভি কভি ছোড় ভি দেতে হ্যায় চুহাকো।
উসকো মারকে খানে সে পহলে বিল্লিনে চুহাকে সাথ কুছ মজাক কর লেতে হ্যায়।
ভাই ভি অ্যায়সা হি কর রহে হ্যায় তেরে সাথ। থোড়া সা ওয়ার্নিং দিয়া তুঝকো। অব
তু সোচলে। কেয়া করে গা তু। সোচ সোচ। হাঁ—কহে দিয়ে ম্যায়নে। তুঝে ম্যায় ফির
ফোন লাগাউঙ্গা। বলেই খট করে লাইনটা কেটে দিল রিসিভারের ওপার থেকে ভেসে
আসা সেই কণ্ঠস্বর।

নিজের হাতের ভেতর রিসিভারের দিকে তাকিয়ে জামসেদ ওয়াদিয়া বলে উঠলেন
ইউ বাস্টার্ড! আই উইল কিল ইউ। আই মাস্ট কিল ইউ।

সমস্ত মুডটা স্পয়েল হয়ে গেছে। বাইরে প্রথম ভাদ্রের রোদ পৃথিবীকে যতটা
তাতান দরকার তার থেকে অনেক বেশি তাতিয়ে তুলেছে।

ফোন পেয়ে মুডটা পুরোপুরি অফ হয়ে গেল। গলার ভেতর পর্যন্ত তেতো হয়ে
গেল। খেতেও তেমন করে ইচ্ছে করছে না।

সরস্বতী খাবার সাজিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। টোটাল মুডটা স্পয়েল হয়ে গেছে
এত বড় সাহস! কলকাতা শহরে বসে এরকম থ্রেটনিং! যাকে বলে বুকের ওপর বসে
দাড়ি ওপড়ান। কেউ কিছু করতে পারছে না ভাইয়ের লোকেদের। আমিও কিছু করতে
পারছি না। ভাবতে ভাবতে নিজের কোল্ট কোমর থেকে হাতের চওড়া পাঞ্জার ওপর
রাখলেন জামসেদ।

রিভলভারের ঠাণ্ডাটুকু হাতের পাতা ছুঁয়ে আছে। ছ-ছটা গুলি আছে ভেতরে
একটা একটা করে ছটা গুলি—যদি পারতাম ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে ভরে দিতে
ভাই—ভাইকে আদমি। কত বড় সাহস! এ রকম ভাবতে ভাবতেই রিভলভারের
চেম্বার খুলে একটা একটা করে বুলেট বার করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন
জামসেদ। তারপর আবার এক এক করে সেই সব গুলি ঢুকিয়ে দিলেন।

সরস্বতী জানে জামসেদের এটা পুরনো খেলা। এভাবে খানিকক্ষণ চলবে। এক বার ঙলি ভরবেন। এক বার বার করবেন। খাওয়া-দাওয়া তার মানে মাথায় উঠল এখন। ঐ ্যাকা পাউরুটি এক দু পিস। তার সঙ্গে একটু চিকেন স্যুপ। ব্যস, হয়ে গেল। হয়ত দু ার কুচি স্যালাডও খাবে। তারপর খানিকটা টক দই। ব্যস, কমপ্লিট। শেষ হলো াওয়া-দাওয়া।

তখনই বেল বেজে উঠল দরজায়।

একবার। দু বার। তিন বার।

বেল বাজানর চরিত্র থেকেই সরস্বতী বুঝে নিতে পারল এ নিশ্চয় সাহেবের সেই াড়ি-পাগলা বন্ধু। ঘড়িয়ালসাহাব। সরস্বতী এই নামই দিয়েছে তার। ঘড়িদারসাহাবও লো যেতে পারে। ঘড়িদার বা ঘড়িয়ালসাহাব বাড়িতে ঢুকলে হলো। ব্যস, কাপের পর াপ কফি। পকোড়া। স্যান্ডুইচ। আর বক বক বক। তার সঙ্গে সিগারেট।

কি যে এত কথা বলে ঘড়িয়ালসাহাব!

ঘড়িয়াল সাহাব বলে। আমাদের এ বাড়ির সাহেব বলে। বলতে বলতে ঘণ্টার পর ণ্টা সময় কাবার। কোনো কোনো দিন কাগজে মুড়ে সাত পুরনো একটা াড়ি—বড়সড় দেয়াল ঘড়ি নিয়ে ঘরে ঢোকে ঘড়িয়াল সাহাব।

ব্যস, হয়ে গেল। সেই ঘড়িটা ঐ দিন থেকে এ বাড়ির দেয়ালে ঝুলবে—সরস্বতী ানে। কি হবে অ্যাত্ত অ্যাত্ত ঘড়ি দিয়ে? তাও আবার পুরনো পুরনো ঘড়ি। দেয়ালে তা আর জায়গা নেই। কয়েকটা তো খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায় পড়ে আছে াটের তলায়। ঘরের কোণে। সে সব তো এ বাড়ির সাহেব খুলেও দেখে না। তবু কনা চাই। আরও ঘড়ি। আরও ঘড়ি। কি হবে অ্যাত সব পুরনো জমানার ঘড়ি কিনে! তার থেকে ব্যাটারির ঘড়ি কত ভালো। সুন্দর দেখতে। দেয়ালে টাঙাও। একশো, একশো পঁচিশ টাকা বড় জোর। একদম কাঁটায় কাঁটায় সময় দেবে।

এ বাড়ির সাহেবকে এটা বললেই চটে মটে লাল হয়ে যাবে। ব্যাটারির ঘড়ি নাকি কোনো ঘড়িই নয়। কি ফট ফট করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে কাঁটা, মানে কোয়ার্জ। এভাবেই কথা বলে এ বাড়ির সাহেব। আর তার বন্ধু—ঘড়িয়ালসাহাব! ওরে বাপরে াপ, তিনি তো পুরনো ঘড়ি বলতে অজ্ঞান। বাতিল খবরের কাগজে মোড়া ঘড়ি নিয়ে আসবেন। তারপর ও ঘড়িকা গুণ বতায় গা। কেয়া ফলানা হ্যায়। কেয়া ঢেকানা হ্যায়। স্রফ ঘড়ি কা বারে মে বাত। অওর বাত।

এসব ভাবতে ভাবতে সরস্বতী খর পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসছে। এর মধ্যেই আবার বেজে উঠল ডোর বেল। টি রি রিং রিং—টি রি রিং রিং—টি রিং রিং রিং—পর পর তিনবার।

সরস্বতী বুঝতে পরে এ নির্ঘাৎ ঘড়িয়ালসাহেব না হয়ে যায় না।

সরসতি দেখো দেখো। ও আঁয়া মনীশ। বেশ একটু জোরেই বলে ওঠেন জামসেদ।

সরস্বতী এ কথার কোনো সাড়া দিল না। সিঁড়ি পেরতে থাকল আরও জোরে।

দরজা খুলতে খুলতেই সরস্বতা দেখতে পেল বেলা গাড়য়ে যাচ্ছে। কিন্তু রোদে
তাপে এখনও কোনো কমি নেই। বেশ গরম চারপাশে। হাওয়া নেই। ওয়াদি
ম্যানসন-এর সামনের উঠোনে, গাছের মাথায় মাথায়, পাতায় ডালে রোদ আর রোদ

মনীশ ঢুকতে ঢুকতে বলল, সাহাব হ্যায়?

ঘাড় নাড়ল সরস্বতী।—আঁছে।

দুপুরে ফোন করলাম কতবার। বেজেই যাচ্ছে। বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরল না
তখন ভাবলাম হয়ত বেরিয়েছে। আগে একদিন বলেছিল অবশ্য ঠাকুরপুকুর যাবে
নানাভাইকে দেখতে। ওর খুব বুজম ফ্রেন্ড। আমিও চিনি। বলতে বলতে বাড়ির ভেতর
ঢুকে পড়ল মনীশ।

মনীশ সরকার—মানে ঘড়িয়ালসাহাবের পরনে শাদা ঢোলা পায়জামা। তার ওপর
ঢিলে হাতা শাদা আদ্দির পাঞ্জাবি। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। রোগাসোগা, লম্বা
মানুষ। লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি ছুঁতে ছুঁতে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

সরস্বতী বুঝল এখনই ওপর থেকে কফির অর্ডার আসবে। তারপর পকোড়া
স্যান্ডউইচও বানাতে হতে পারে। সরস্বতীর এমন ভাবনার ভেতরই ওয়াদিয়া ম্যানসন
এর অনেকগুলো দেয়াল ঘড়ির মধ্যে কোনো একটা ঢং ঢং ঢং করে বেজে জানিয়ে
দিল এখন পাঁচটা বাজে।

পাঁচটা বেজে গেল! নাকি ভুল সময়! সরস্বতী ঠিক মতো বুঝতে পারল না।

আট

কুরুর কুরুর কুরুর কুরুর করে ফোন বেজে উঠতেই ঘুমটা চটকে গেল
জামসেদের। একটু আগে লোডশেডিং হয়েছে। তাতে ফ্যান বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর
গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তখনই ঘুম ভেঙেছিল একবার। তারপর এই ফোন। একেবারে
কান ধরে তুলে দিল। ফোন এলেই ইদানীং কেমন যেন একটা অস্বস্তি তৈরি হয়
বিশেষ করে ওয়াদিয়া ম্যানসন সাত কাঠা জমি সমেত কিনে নেয়ার তালে হুমকি দেয়
লোকদের গলা ফোনের ওপর থেকে শুনলে মাথার রক্ত চলকে ওঠে। শুধু মাথার
ভেতরই রক্ত চড়ে না। পায়ের রক্তও বুঝি উঠে আসতে চায় মাথায়।

হ্যালো, ওয়াদিয়া স্পিকিং।

ম্যায় গীতা। হোটেল সুন্দর সে আপকা স্বাগত করতি হুঁ।

ঘুম জড়ান চোখে একগাদা বিরক্তি জড়িয়ে ছিল। তার ঝাঁঝ বেরিয়ে এল গলা
দিয়ে—হাঁ বোলিয়ে। কেয়া চাহতি হ্যায় আপ।

জি কুছ নহি। ম্যায় জাননা চাহতি হুঁ আখির কব আপ ইয়ে হোটেল ভিজিট কিয়ে
থে।

ম্যায় করিব তিন সাল পহেলে আপকি হোটেল সুন্দর মে পধারে থে।

বাত ইয়ে হ্যায় জনাব কি, হোটেল সুন্দর মে যো বুফে সিস্টেম হ্যায় উসমে খানেকা আইটেম মে ফরটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট চাল্ রহা হ্যায়।

ভাদ্র মাসের দম ধরা গুমোট। লোডশেডিং হয়ে যাওয়ার পর কোথাও এতটুকু হাওয়া নেই। দরদর করে ঘামতে ঘামতে জামসেদ বললেন, ও ইয়েস।

ইয়ে বুফে সিস্টেম মে খানা স্রিফ আপকে লিয়ে হি নহি, আপকে সারে পরিবারকে লিয়ে লাগু কর দিয়া গয়া হ্যায়।

কি আশ্চর্য! কলকাতার হোটেলগুলোর হলো কি! ব্যবসা করার জন্যে ক্লায়েন্ট ধরার ব্যাপারে তারা এখন হিন্দি চালাচ্ছে। এতে তো কাস্টমার ফসকাবে। ভাবতে ভাবতে ছোট হাত-তোয়ালেতে কপাল ঘাড় মুখ বুক ভালো করে মুছলেন জামসেদ। তারপর রিসিভার কানে লাগান অবস্থায় বললেন, ও ইয়েস।

আপকে দোস্ত কো ভি আপ ইয়ে স্কিম পে লা সকতে হ্যায় মিস্টার ওয়াদিয়া। হমলোগ ড্রিংকস কা উপ্পর ভি থার্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দে রহি হুঁ। যো বার হ্যায়, উসমে স্রিফ হারড ড্রিংকসই নহি, সফট ড্রিংক্স ভি মিলতা হ্যায়।

পারডন।

বোলা না যো বার হ্যায় হোটেল মে উসমে ড্রিংকস কা উপপর থারটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট চালু কিয়া গয়া। কভি ভি আপ ইসে ইস্তেমাল কর সকতে হ্যায়। আপনে ফ্রেন্ডস অর রিস্তেদারোঁ কে সাথ। হলিডেজ মে ভি আপকো সিট বুকিং করনে কে লিয়ে স্পেশাল ফেসিলিটিজ মিলেগা। দ্য ফুড আইটেমস আর ভেরি গুড ইন কোয়ালিটি অ্যান্ড টেসট। অ্যান্ড কোয়ালিটি অফ ড্রিংকস টু ইজ ভেরি গুড।

তো ইয়ে সব ফেসিলিটিজ পানে কে লিয়ে মুঝে কেয়া করনা পড়েগা?

কুছ নহি সার। কুছ নহি। স্রিফ পাঁচ হাজার রুপাইয়া ডিপোজিট করকে আপ হমারে হোটেল কা অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার বন যাইয়ে। অর ফেসিলিটিজ লেতে যাইয়ে।

ইউ সি ম্যাডাম, মেরা তো ইতনা রুপাইয়া নহি হ্যায়। যিসনে হম আপকা যো হোটেল হ্যায় উসকো অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার বন সকে। দিস ইজ নট মাই কাপ অফ টি।

ইয়ে কেয়া বোল রহে হ্যায় ওয়াদিয়াসাহাব। হমলোগ আপকা বারে মে থোড়া বহত জানতি হুঁ।

কেয়া জানতি হ্যায় আপ! কেয়া জানতি হ্যায়! ম্যায় এক সিম্পল আদমি হুঁ। এজ সেভেনটি টু প্লাস হো চুকে হ্যায়। কোই দিন মর যাউঙ্গা। কিঁউ আপনে মুঝকো আলিবাবাকা খাজানেকা লালচ দিখা রহি হ্যায়। আই থিংক ইউ নো দ্য আলিবাবা অ্যান্ড মরজিনা অফ্ অ্যারেবিয়ান নাইটস।

ও ইয়েস, সার্টেনলি।

সো হোয়াই ইউ এনকারেজিং মি টু গেট দ্য সিক্রেট পাস ওয়ার্ড অফ আলিবাবাকে

খাজানা? খুল যা সিম সিম, খুল যা সিম সিম। বলতে বলতে গরমে ঘেমে চুমে একশ
জামসেদ, কানের রিসিভার কান থেকে সামান্য সরিয়ে ছোট হাত-তোয়ালেতে আবারও
ঘাড় মুখ হাত মুছে নিলেন।—গীতা, ডু ইউ ফলো মি! ডু ইউ নো দ্য স্টোরি অফ
আলিবাবা, অ্যান্ড হিজ খাজানা? ডু ইউ নো দ্য স্টোরি অফ অ্যারেবিয়ান নাইটস অ্যান্ড
সিক্রেট কোড অফ দ্য ডেকোইটস? খুল যা সিম সিম—খুল যা সিম সিম।

ও ইয়েস, সার্টেনলি। বলেই ফোনের ওপাশে হাসির ঝরনা।

দেন হোয়াই ইউ ইনসিসট মি, মুঝে কাহেকো সপনা দিখা রহি হ্যায়! ও
আলিবাবাকে খাজানে কা!

সার, বাত ইয়ে হ্যায় অগর আপ চাহে আপ বন সকতে হ্যায় হোটেল সুন্দর কা
অ্যাসোসিয়েটেড মেম্বার। অর আপ নহি চাহে তো, আপ নে আপকে কিসি ফ্রেন্ডকে
বোল সকতে হ্যায়। ম্যায় আপকো মদত করুঙ্গি। আগর আপ নে কিসি ফ্রেন্ডকে
আপনা জুবান সে বোলনা নহি চাহতে তো আপ মুঝে উস আদমি কো নাম, পতা অর
ফোন নাম্বার দে সকতে হ্যায়। ম্যায় উসকো ফলো আপ করুঙ্গি। বলতে বলতে
রিসিভারের ওপার থেকে আবারও ঝন ঝন করে হাসল গীতা।

সরি ম্যাডাম, ম্যায় আপকো মেরে কিসি দোস্ত কা পতা অর ফোন নাম্বার নহি দে
সকতে হ্যায়। ফোন করনে কে লিয়ে বহোত বহোত সুক্রিয়া। ধন্যবাদ।

থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। ইফ আপনে কভি ভি ইন্টারেস্টেড হুয়া হোটেল
সুন্দর কি বারে মে, প্লিজ কন্ট্যাকট মি। মাই নেম ইজ গীতা, মাই ফোন নাম্বার ইজ—
প্লিজ রিমেমবার স্যার। ওকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।

থ্যাংক ইউ। বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জামসেদ। আর তখনই আলো এল
ফ্যান ঘুরল। আঃ, কি আরাম এই হাওয়ায়। ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোখ
বুজে ফেললেন জামসেদ।

পুরনো 'ক্যালকাটা' ফ্যানের হাওয়া তাঁর শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে।

ইলেকট্রিকের ঘোরা পাখার বাতাসে গায়ের ঘাম শুকোতে শুকোতে তাঁর মনে
পড়ল বছর খানেক আগে এ রকমই এক উড়ো ফোনের কথা।

ফোন ধরতেই রিসিভারের ওপাশ থেকে সুন্দর নারী কণ্ঠ। অ্যামেরিকান অ্যাকসেন্টে
ইংলিশ। সোনালি রিসর্ট-এর পক্ষ থেকে তাঁকে র‍্যানডম চয়েস-এর মধ্যে দিয়ে
সিলেকশান করা হয়েছে। মিস্টার ও মিসেস ওয়াদিয়াকে সোনালি রিসর্টএর তরফ
থেকে আমন্ত্রণ জানান হচ্ছে। বলে তারা সাউথ ক্যালকাটার সতীশ মুখার্জি রোডের
একটা ঠিকানা বলল।

এরুচশা তখনও বেঁচে। দুজনে গেলাম। নিজেই ড্রাইভ করে গেছি। খুঁজে বার
করলাম সতীশ মুখার্জি রোডের সেই ঠিকানা। তখন প্রায় বিকেল। একটা বেশ বড়সড়
ঘরের ভেতর অনেকগুলো টেবিল। সেই টেবিলে সব কাপলরা। নানা বয়সের।

একটা স্টেজ মতো করা হয়েছে ঘরের ভেতর। সেখান থেকে খুব স্মার্ট ছেলে-মেয়েরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে নাম অ্যানাউন্স করছে এক একজন কাপল-এর। সঙ্গে সঙ্গে হাততালি আর নানা প্রশংসাসূচক বাঁধা গত। কফি পৌঁছে যাচ্ছে টেবিলে টেবিলে। হালকা স্ন্যাকসও তার সঙ্গে। এরপর লাকি কাপলস—যাঁরা আজকে সোনালি রিসর্ট-এর এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন, তাঁদের জন্যে গিফট পৌঁছে যাচ্ছে টেবিলে টেবিলে। সুন্দর করে ভালো কাগজে র‍্যাপ করা একটা বাক্স। কৌতূহল হলেও খোলার উপায় নেই। সেটা দেখতে ভালো লাগে না।

এবার খুব স্মার্টলি ঘোষণা হচ্ছে মঞ্চ থেকে। লটারিতে নির্বাচিত হওয়া যেসব লাকি কাপলরা আজকে সোনালি রিসর্ট-এর আমন্ত্রণে এখানে এসেছেন, তাঁরা এখন সোনালি রিসর্ট-এর সদস্য-সদস্যা হওয়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করবেন। সোনালি রিসর্ট-এর উদ্যোগে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাইরে—মরিশাস, মলদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, নেপালে থাকার দারুণ দারুণ সব জায়গা তৈরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে টাঙান শাদা পরদায় প্রজেকটর থেকে গড়িয়ে নামা ছবি আছড়ে পড়ল। পুরীর সমুদ্র বেলায় গোল্ডেন স্যান্ডের ওপর সারি সারি কটেজ। হাতের কাছেই সমুদ্র। উধাও নীল আকাশ। নারকেলকুঞ্জ। নীল ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে সোনা রঙ বালির ওপর। কি তার ফেনা। গর্জন করে সমুদ্র এগিয়ে আসছে। তার জল ছোঁয়ার জন্যে কোনো ভিড় নেই। 'স্বর্গদ্বার বিচে' যে গ্যাজাগেজি ঠ্যালাঠেলি ভিড়, মনে হয় সমস্ত কলকাতাই বুঝি উঠে এসেছে এখানে, তার চিহ্নমাত্র নেই এই সোনালি রিসর্ট-এর কটেজের চারপাশে। দেখলে চোখ শরীর মন—সবই জুড়িয়ে যায়। কি সুন্দর সমুদ্র-চিলরা আড্ডা দিচ্ছে বালিভূমির ওপর। উধাও নীল আকাশেও তাদের উড়ে বেড়ান চোখে পড়ে। বিচের ওপর উল্টে রাখা নুলিয়াদের একটা দুটো নৌকো। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য ছবি। মনে হয় এখনই ছুটে যাই।

প্রজেকটারের ছবি বদলে যায় শাদা পরদায়। ভেসে ওঠে মলদ্বীপের সৌন্দর্য, সিঙ্গাপুরের রূপবাহার, মারিশাসের রূপমাধুরী। সমুদ্র কি সুন্দর মারিশাসে। সাগরের কি অসামান্য বিউটি সিঙ্গাপুরে। তাছাড়া এই দেশের মার্কেট কমপ্লেক্স, রাস্তাঘাট—সব একটু একটু করে ফুটে উঠল স্লাইড শোয়ে।

নিজের ঘরে বসে বসে সব মনে পড়ে গেল জামসেদ ওয়াদিয়ার।

নেপালের পাহাড়, মার্কেট কমপ্লেকস, রাজাদের প্রাসাদ, পশুপতিনাথের মন্দির—সব পর পর রঙিন ছবি হয়ে জেগে উঠল শাদা পরদার ওপর। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। ভারতবর্ষের আরও তিন-চারটে ট্যুরিস্ট স্পটে তৈরি সোনালি রিসর্ট-এর কটেজ রঙিন ছবি হয়ে সামনে ভেসে এল। সঙ্গে ধারাভাষ্য। ঐ স্টেজ থেকেই বলে যাচ্ছে কর্ডলেস হ্যান্ড মাইক হাতে নেয়া ছেলেটি।

সুন্দর স্পষ্ট উচ্চারণ। বলে যাচ্ছে হিন্দি, ইংরেজি ও বাংলায়—পর পর। স্লাইড শো

হতে না হতেই টেবিলে টেবিলে পৌঁছে গেল ফরম। দেখে শুনে সই করতে হবে ফিলাপ করে দেয়ার পরই সোনালি রিসর্ট-এর মেম্বারশিপ হয়ে গেল। এককালীন আট হাজার, দশ হাজার, পনের হাজার, আঠের হাজার টাকা। এখনই দেয়ার দরকার নেই ধীরেসুস্থে চেক কেটে দিলেই হবে। বাড়িতে গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে সোনালি রিসর্ট এর প্রতিনিধি। ব্যাপারটা এমনভাবে পরপর হয়ে যাচ্ছে যে, ফর্ম ফিলাপ না করে উপায় থাকে না। সোনালি রিসর্ট-এর শেয়ার হোল্ডার হওয়ার পর বছরের যে কোনো সময়ে সেখানে গিয়ে থাকা যাবে। নিজে না গেলেও পছন্দ মতো লোকজন পাঠিয়ে দেয়া যাবে সেখানে। তিন দিন নিশ্চিন্তে থাকা, বছরে দুবার। সারা জীবনের জন্যে এই সুযোগ বহাল থাকবে।

বাঙালি বেড়াতে ভালোবাসে। সুতরাং বিষয়টি বেশ আকর্ষণীয়। তাই ফর্ম ফিলাপ করে বাড়িতে গিয়ে চেক পাঠিয়ে দিলেই শেয়ার হোলডার হয়ে যাওয়া গেল সোনালি রিসর্ট-এর।

অনেকেই মাথা নিচু করে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ফর্ম ফিলাপ করছে। কফি স্ন্যাকস খাওয়া হয়ে গেছে। টেবিলে টেবিলে পৌঁছে যাচ্ছে সুন্দর করে মোড়া গিফট প্যাক এখন ফর্ম ফিলাপ না করলে—। তবু দু চার জন গাঁইগুঁই করে উঠে দাঁড়ালেন বললেন, ভেবে দেখছি। যে সব কাপলরা রাজি হলেন না ফর্ম ভর্তি করতে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ওয়াদিয়া দম্পতি—জামসেদ ও এরুচশা ওয়াদিয়া।—জাস্ট নাউ উই আর নট রেডি ফর ইট। জামসেদ টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন।

দ্যাটস ওকে। দ্যাটস ওকে। ইট ইজ নট অ্যাট অল আ প্রবলেম।

সুন্দর পোশাক-আশাক পরা ভালো মুখশ্রী ও চেহারার ছেলেমেয়েরা কেউ-ই নাম বলছে না নিজেদের। তারা সবাই কথা বলছে ভাব বাচ্যে। কারও নাম জানার উপায় নেই ওদের মধ্যে বলা কথাবার্তা থেকে। এটাও কি নিজেদের এক কৌশল! আড়াল করে রাখা প্রত্যেকের নাম! যাতে পরে না বিপদ হয় কোনো!

ইউ প্লিজ সাইন। অ্যান্ড দেন আওয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ উইল গো অ্যাট ইওর অ্যাড্রেস অ্যান্ড কালেকট দ্য চেক।

নো। আই উইল নট সাইন। বেশ একটু শক্ত সুরেই বললেন জামসেদ। তারপর এরুচশার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, লেটস গো।

নো সার। প্লিজ, প্লিজ হিয়ার মি। ইটস আ গ্রেট অফার টু ইউ।

আই ডোন্ট লাইক ইট। এরুচশা, কাম অ্যান্ড লেটস গো। বলেই গট গট করে বউয়ের হাত ধরে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম সোনালি রিসর্ট-এর লোক ধরার ফাঁদ থেকে।

জামসেদ ওয়াদিয়ার মনে পড়ল বাড়িতে ফিরে এরকমই অনেকগুলো ফোন পাই পরপর। তাতে বলা হলো, আমি কেন সোনালি রিসর্ট-এর শেয়ার হোলডার কিংবা

অ্যাসোসিয়েটেড মেমবার হচ্ছিনা। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেও এরা নাছোড়বান্দা! একেবারে এঁটুলি হয়ে লেগে থাকে গায়ের সঙ্গে। কিছুতেই ছাড়ে না। তারপর সেই সব ফোনে কেমন যেন চাপা হুমকিও মিশে থাকে মাঝে মাঝে। এমন মনে হয় জামসেদের। ভালো ঝামেলায় পড়া গেল তো বাবা! বিরক্তিকর ঘ্যানঘ্যানানি। গাড়ির তেল পুড়িয়ে কফি আর স্যান্ডউইচ খেয়ে এসে মহা বিপদ হলো তো। এখন ঠ্যালা সামলাও। এরুচশা অবশ্য ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় ওদের দেয়া গিফট প্যাকটা হাতে করে নিয়ে এসেছে। বাড়িতে ঝলমলে কাগজের মোড়ক খুলে দেখেছি গায়ে ল্যাকার করা দুটো বেশ বড় পোড়ামাটির কাপ। কফি খাওয়া যায় তাতে।

এরুচশার এই গিফট প্যাক তুলে নিয়ে আসার ব্যাপারে একটু বিরক্তও হয়েছিলাম। —কেন আনতে গেলে এসব! আমরা যখন অ্যাসোসিয়েটেড মেমবার, শেয়ার হোল্ডার—কিছুই হলাম না, তখন দরকার কি ছিল!

এরুচশার যুক্তি, তা কেন! ওরা তো এমনিতেই লোক ডেকে ডেকে ঠকাচ্ছে। তো ওদের দেয়া গিফট নিয়ে খানিকটা যদি ওদের খরচের মধ্যে ফেলা যায়।

এটা কোনো যুক্তি হলো! জামসেদ খুব আস্তে এটুকু বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু সোনালি রিসর্ট-এর পক্ষ থেকে সেই ফোনের ঝড় থামল না। বরং বেড়েই চলল। নাছোড়বান্দা যাকে বলে একেবারে, তাই। আর এই নাছোড়পনার সঙ্গে খানিকটা বোধহয় হুমকিও মিশে থাকে।

শেষ অব্দি একদিন—জামসেদ ওয়াদিয়ার মনে পড়ল, আমি বাধ্য হলাম 'আজকাল'-এর 'প্রিয় সম্পাদক বিভাগে' একটা চিঠি লিখতে। ওখানে বেশ কয়েকজন সিনিয়ার রিপোর্টার, অ্যাসিসটেন্ট এডিটরদের সঙ্গে আলাপ আছে। তাদের কয়েকজন ব্যাপারটা শুনে বলল, এখনই চিঠি লেখ। আমরা ছেপে দেব। চিঠি লিখলাম। ছাপা হলো। ব্যস, তার সাতদিনের মধ্যে সোনালি রিসর্ট-এর পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকার ডিফেমেশন স্যুট করে আমায় এক রেজিস্ট্রি চিঠি।

চিঠি পেয়ে একটু থমকালাম। তারপর ছুটে গেলাম আমার ব্যারিস্টার নবি চৌধুরির কাছে। নবিবাবু সব শুনলেন চুপ করে। পার্কসার্কাসে ট্রাম ডিপোর আগে গলির ভেতর খানিকটা ঢুকে তাঁর ফ্ল্যাট। ব্যাচেলর মানুষ। চেম্বার সব সময় ভিড়। সব শুনে টুনে নবিবাবু বললেন, চুপ করে বসে থাকুন। মামলাটা ওদের করতে দিন, তারপর আমি দেখব।

কি বলছেন আপনি! দশ লক্ষ টাকার মানহানির মামলা, সেখানে চুপ করে বসে থাকব!

হ্যাঁ থাকবেন। আমি বলছি বলেই, বসে থাকবেন। দশ লক্ষ টাকার ডিফেমেশন তো কি হয়েছে? আমি তো রইলাম।

দেখবেন, ফেঁসে না যাই।

আরে, বললামই তো আমি আছি।

কিছু হলেও সামলাবেন আপনি।

সে সামলে দেবখ'ন। বলতে বলতে নবি চৌধুরি আমার দিকে তাকালেন জামসেদের মনে পড়ল। তেমন লম্বা নন। ফরসা মানুষ। সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা রোগা-পাতলা মানুষটির তীক্ষ্ণ নাক। কাটা কাটা মুখ চোখে সরু ফ্রেমের বাই ফোকাল চেম্বারে আদ্দির পায়জামা আর সরু পায়ের আলিগড়ি পরে বসে। কথাবার্তা, উচ্চারণে ভরপুর আত্মবিশ্বাস। প্রতিটি কথায় যাকে বলে কনফিডেনস।

নবি চৌধুরির চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

তারপর অবশ্য আর এক কাণ্ড! 'আজকাল'-এ চিঠি বেরনর পর সোনালি রিসর্ট এর পক্ষ থেকে 'আজকাল'-কেও এক চিঠি ঝাড়াল। সেখানে মানহানির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ফিফটি ল্যাখস-এর ডিফেমেশন কেস। কিন্তু তারপরই ছবিটা বদলে গেল। 'আজকাল'-এর 'প্রিয় সম্পাদক' বিভাগে বেশ কয়েকটা চিঠি বেরল পরপর—সোনালি রিসর্ট-এর এই ফাঁদ বিষয়ে। কীভাবে কীভাবে প্রতারিত হয়েছেন হচ্ছেন সাধারণ মানুষজন—দিনের পর দিন—তারই একটা ঘনিষ্ঠ ছবি।

চিঠিগুলো বেশ গুরুত্ব দিয়েও ছাপল 'আজকাল'। তারপরই হাওয়া গেল ঘুরে সোনালি রিসর্ট-এর এই ধরনের ফাঁদ পেতে লোক ধরা আর তাদের কাউকে কাউকে 'বধ' করে টাকা আদায় করার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল বহুজনের সামনে। আমি খবর পেলাম—'আজকাল' থেকেই আমার পরিচিত অ্যাসিসটেন্ট এডিটর জানাল লালবাজার থেকে লোক গেছে 'আজকাল'-এ সোনালি রিসার্ট-এর খোঁজ খবর করার জন্যে। তাঁরা আমাও ফোন নম্বার চেয়েছেন। সঙ্গে অন্য চিঠি লিখিয়েদেরও। কারণ যাঁরা চিঠি লিখেছিলেন 'আজকাল'-এ এই ব্যাপারে, তাঁরা অনেকেই এভাবে ফাঁদ পেতে আর্থিক প্রতারণার কথা লিখেছিলেন। যদি মামলা হয় পরে, কিংবা ভবিষ্যৎ তদন্তের স্বার্থে ওঁরা ফোন নম্বর চাইছিলেন। 'আজকাল' থেকে অবশ্য লালবাজার থেকে আসা মানুষদের আমার ফোন নম্বর দেয়া হয়নি। পরে কি জানি কি করে সব চাপা পড়ে গেল আস্তে আস্তে।

নবি চৌধুরি আমায় বলেইছিলেন, ওরা করুক না মামলা। মামলা করলেই ওরা ক্যাঁচায় পড়বে। করতে দিন ওদের মামলা। তারপর যা করার আমি করব।

পরে যখন সোনালি রিসর্ট-এর পক্ষ থেকে আর কোনে ট্যাঁ-ফোঁ করছে না, তখন একদিন নবি চৌধুরির চেম্বারে আবার হাজির হলাম। জামসেদের মনে পড়ল! সেদিন খুব ভালো মুডে ছিলেন নবিবাবু। বেশ মজা করেই বললেন, কি হলো মিস্টার ওয়াদিয়া বলেছিলাম না, ওদের মামলা করতে দিন। মামলা করলেই ওরা সোজা গাড্ডায় গিয়ে পড়বে। তাই তো হলো, না কি? বলতে বলতে আবারও শব্দ না করে হাসলেন নবি চৌধুরি।

সবটা পরপর মনে ভেসে উঠল জামসেদের, হোটেল সুন্দর থেকে গীতার ফোন পাওয়ার পর। অনেকটা সময় নষ্ট হলো মেয়েটির সঙ্গে ফোনে কথা বলে। কিন্তু উপায় কি! একজন ফোন করেছে। তাছাড়া নবীন-কণ্ঠস্বর কানে শুনলে মন ভালো হয়ে যায়। গীতার গলা, বলার ভঙ্গি বেশ সুন্দর। এই মরা মরা ঘরের ভেতর কেমন যেন টাটকা বাতাস বয়ে যায়।

একটু ভাবার পরই আবার ফোন।

ইয়েস। ওয়াদিয়া স্পিকিং।

আঙ্কল! ম্যায় রোজি।

তুমহারি পাপা ক্যায়সে হ্যায় বোলো বেটা।

য্যায়সা থা, অ্যায়সেহি।

ক্যাথিটার হ্যায় আভি?

হ্যায়।

য়ো ফ্লাকচুয়েটেড বি পি?

থোড়া স্টেবল কিয়ে হ্যায়। লেকিন সুগার অওর বাঢ় গ্যায়ে।

কেমো থেরাপি যো চল রহা থা য়ো তো পরশোঁ খতম হোনে কা বাত থা।

হাঁ। কোর্স তো কমপ্লিট হো গ্যায়ে। বস, এক দো রোজ অবজারভেশন মে রহেগা পাপা। অওর উসকে বাদ লে আউঙ্গি ঘর পর।

কাঁহা লে যাওগে বেটা?

মেরি ঘর পে।

হ্যাঁ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পে—তুমহারি ঘর লে যাও। কিড স্ট্রিট কা ফ্ল্যাট মে মত ভেজো। সমঝি কি নেহি? যাঁহা কোই নহি হ্যায়। য়ঁহা অকেলে ক্যায়সে রহেগা নানাভাই!

হাঁ, সমঝ গ্যয়ি হুঁ।

হাঁ তুম, তো কাফি সমঝদার লড়কি হো। সব কুছ সমঝতি হো।

আঙ্কল, বিপদ তো একটা নয়। অনেকগুলো।

কেন, আবার কি হলো বেটি?

অবশ্য এসব কথা-বার্তা হিন্দিতেই চলছে।

বিপদ মানে, আমার কাকা বাবুভাই ওয়াদিয়া।

হ্যাঁ, জানি তো। তাকে রিপোর্ট তৈরি করে দিয়েছ! এইমস—এ আই এম এস-এ যে পাঠাবে বলছিল।

হ্যাঁ—আঙ্কল তো পাঠিয়ে দেবে। লেকিন আমিই এখনও সবটা অর্গানাইজ করতে পারিনি। বাবাকে বাড়ি নিয়ে আসি আগে। তারপর গুছিয়ে দেব সব। একা—সবটাই তো একা করতে হবে না আমায়। নিজের চেম্বার, পেশেন্টদের সামলে।

বুঝি ডিয়ার, সবই বুঝি। বলতে বলতে বড় করে শ্বাস চাপলেন জামসেদ। আসলে তুমি একদমই একা পড়ে গেছ।

ঠিক একা নয় আঙ্কল। সত্যি বলতে কি বাবা অনেকের সঙ্গে বসত। আড্ডা দিত। ড্রিংকস নিয়ে বসত। ক্লাব, গলফ খেলা। শেয়ার মার্কেটে রেগুলার বসা। সেনসেক্সের ওঠাপড়া। টাকার হিসেব। নানারকম সার্কল। কিন্তু আমার ব্যাপারটা কি জানো তো, বাবার যারা বন্ধু, তাদের দেখতাম। নানা রকম মানুষ। বিভিন্ন স্ফিয়ারের। কিন্তু অনেকের মুখই রিভিসন করা হয় নি। রিভিসন বোঝ তো! পড়ার কোর্সে যেমন আমরা রিভিসন করি। তেমনি বাবার বন্ধুদের অনেকের মুখ, চেহারাই আর রিভিসন করা হয় নি। বিশেষ করে বাবার এতবড় একটা অসুখের পর। আগেও তো বলেছি তোমায়। বলতে গেলে কেউই আসেনা প্রায়। বুঝি ঠাকুরপুকুরটা একটা বেপট জায়গা। ফিজিক্যালি পৌঁছনো বেশ কষ্টের ব্যাপার। বহোত তকলিফ কি বাত হ্যায়। লেকিন যো সাচ্চা দোস্ত হোগা, য়ো তো আয়েগা হি না, আপনে দোস্ত সে মিলনে। তাই এই পয়েন্টে বাবার বন্ধু—বন্ধু বলব না, মেশামেশির লোকজনদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আর রিভিসান হয়নি।

রোজির আগের কথার জের টেনে জামসেদ বললেন, হাঁ, হাঁ। য়ো লোগ তো আয়েগা জরুর।

লেকিন আঙ্কল—যাদের আমি দেখেছি বাবার সঙ্গে ঘুরতে, খানা-পিনা করতে, মস্তি মজাকে সময় কাটাতে, তারা এখন সবাই কেটে গেছে। কেউ কোনো খবরই রাখতে চায় না। এ জন্যে বললাম না, মুখের রিভিসান করা হয়নি। ফলে এই অসুখের ঝড়-ঝাপটায় অনেকেরই মুখ আড়ালে চলে গেছে। সকলকে আর মনে পড়ে না। আর আমি মনে করতে চাইওনা সবাইকে।

ইটস কোয়াইট ন্যাচারাল বেবি। কোয়াইট ন্যাচারাল।

এই তোমার সঙ্গেই আঙ্কল যা একটু কথা হয়। তুমি বাবাকে দেখতে যাও। প্রায় নিয়মিতই দেখতে যাও। খবর নাও। কখনও অন্য কাজ আছে বলে এড়িয়ে যাও নি।

ছাড় এসব। ওতো করতেই হয় কাউকে না কাউকে। আমি না করলেও কেউ করত। সুতরাং ওটা নিয়ে তুমি অত ভেব না।

না, ভাবছি না। কিন্তু মনে কষ্ট হলো, তাই বললাম।

তুমি মন খারাপ ক'রনা বেবি।

না, না। মন খারাপ কেন করব? দুঃখের কথা মনে এল তাই, তোমায় বললাম। কথা বলারও তো লোক নেই আঙ্কল। মন খুলে যে কোথাও হালকা হব, তারও উপায় নেই কোনো। এভাবেই চলতে হচ্ছে, চালাতে হচ্ছে। খুব কষ্টে থাকি কখনও, যখন বাবার কথা মনে পড়ে—এমন একটা ফুর্তিবাজ রিসোর্স ফুল মানুষ। সব সময় আনন্দ খোঁজা লোক, আড্ডা, বন্ধুদের জন্যে নিবেদিত প্রাণ—তার এখন কি অবস্থা! সকালের দিকটা

বলতে গেলে ঘুম ঘুম, কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব। লোকজনও সব সময় ঠিক মতো চিনতে পারে না।

চিনতে পারে না, না কি চিনতে চায় না? কই, আমরা—মানে আমি গেলে তো বেশ কথা বলে। সে সব কথার মধ্যে হয়ত সামান্য জড়তা, একটু যেন জড়ান ভাব হয়ত আছে—কিন্তু যাকে বলে একদম রিকগনাইজ না করা, তা-তো হয় না কখনই। যে কবার গেছি প্রত্যেক বারেই এই অভিজ্ঞতা।

আগেই বলেছি আঙ্কল, তুমি নিজেকে দিয়ে সবার সঙ্গে তুলনা ক'রনা। তোমার কথা আলাদা—সেতো আমি বরাবরই সবাইকে বলি। কিন্তু বাবার এই যে চুপ করে থাকা, কথা না বলে, দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকা, খাদ্যের প্রতি অনীহা—সব দেখে আমার একেবারে ব্রেকিং পয়েন্টে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা আঙ্কল। কত, কত ফাইট করব আমি! কত লড়ব! যখন—গত বছর সেপ্টেম্বরের শেষে শরীর খারাপ হলো—ব্ল্যাক আউট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বাজারে গিয়ে, তখন ভাবলাম নিশ্চয় হার্টের প্রবলেম। সেই লাইনে চিকিৎসা কি হবে, ভাবতেও শুরু করে ছিলাম। কিন্তু ব্রেন টিউমার। তারপর ম্যালিগনেন্সি—এতো চিন্তাতেও আসেনি। আমরা—আমি আর নওরোজি ভাবতাম আনটির ওরকম সাডেন ডেথ হয়ে গেল, রিভলভারের গুলিতে, বাড়ি থেকে বেরল আর ফিরল না, বাবার বেলাও ওরকমই কিছু একটা হবে—হঠাৎ একটা বড় ধরনের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, ম্যাসিভ অ্যাটাক। ব্যস, সব শেষ। কারণ বাবা তো কখনও কারও কথা শোনে নি। সব সময় করেছে নিজের মতো। নিজে যা ভালো বুঝেছে, তাই করে গেছে। রেকলেস লাইফ। কোনো নিয়মকানুন নেই। খাওয়া- দাওয়া, পান-ভোজনে কোনো রেস্ট্রিকশান নেই, তো এরকম কিছু একটা হঠাৎ হয়ে যাবে। আমরা তৈরি হওয়ার সময়ও পাবে না। বলতে বলতে নাকের জল টানল রোজি।

জানি বেবি, তোমার খুব কষ্ট।

বাবার এই তকলিফ, পরেশানি আর দেখা যাচ্ছে না। অত সেনসেটিভ, ব্রেইনি মানুষটা ক্রমশ হুদবুদ শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে থাকে এমন ফ্যাল ফ্যাল করে—ভেকেনট লুক, যে কষ্ট হয় খুব।

বুঝি ডিয়ার রোজি তোমার কষ্ট।

আর আরও একটা ব্যাপারে কষ্ট বাড়ে। সেটা তুমি বুঝবে আঙ্কল, নিজে ডাক্তার হয়ে কিছু করতে পারছি না। যদিও আমার চিকিৎসার এরিনা এটা নয়, কিন্তু যদি মানুষটাকে খানিকটা সুস্থও করতে পারতাম। বাঁচিয়ে রাখতে পারতাম কয়েকটা বছর, তাহলে অন্তত একটা মানসিক শান্তি থাকত। মনে হত ফাইট দিয়েছি কিন্তু ব্যাটেলটা আমি পুরোপুরি হারিনি। খানিকটা হলেও অসুখ পেছিয়ে গেছে আমার কাছ থেকে লড়াইয়ে। কিছুটা হলেও জিতেছি।

আসলে অসুখটা ব্রেন ক্যানসার না—ভয়াবহ। তোমার সব অর্গানগুলোকে আস্তে

আস্তে অকেজো নষ্ট করে দেবে এই অসুখ। ব্রেনই তো আমাদের বডির মূ
কমপিউটার। সেটায় গোলমাল হয়ে গেলে তো সবই চৌপাট। হাত, পা, মাথ
মুখ—চোখ, সবই কনট্রোলের বাইরে। নানাভাইয়ের তো তাই হয়েছে বেবি। তোমা
পাপা—তুমি আরও ভালো করে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ। তার ওপর তু
একজন রিনাউনড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। তোমার কাছে তো কিছু আননোন ন
বেবি। এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। ফলে তোমাকে নতুন করে বলার কিছু নেই।

তোমার অনেকক্ষণ ধরে আটকে রেখেছি আঙ্কল। বিরক্ত করছি হয়ত। কিন্তু
ব্যাপারে আমি একেবারে জ্ঞান-পাপী। বলতে পার সব জেনেবুঝেই করছি এসব। শ
হলেও বাবা তো। জন্মদাতা পিতা। সব বুঝতে পারছি—সে ভাবে কোনো ওষুধই নে
এ-রোগের। কিন্তু ঐ লিটল হোপ। এই হোপ নিয়েই তো বাঁচে মানুষ। বেঁচে থাকে
যদি কোনো কাজ করে ওষুধ—একটু বেশি কাজ করে। রেডিয়েশানের পর কেমো
তো দিচ্ছি এই জন্যে।

লেকিন বেবি, রেডিয়েশানের ফলে অসুস্থ—ক্যানসার আক্রান্ত সেল যেমন মরে
সুস্থ সেলেরাও মারা যায়। ডোণ্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। কিছু মনে করো না তু
মনে ক'র না এই বৃদ্ধ তোমায় সুযোগ পেয়ে খানিকটা জ্ঞান ঠুসে দিচ্ছে—

না, না —তা কেন! তুমি বল আঙ্কল।

বলছিলাম কি, রে দেয়ার ফলে অসুস্থ—ক্যানসারের কামড় খাওয়া সেলেরা মা
গেছে। ঠিক আছে। ওদের তো মৃত্যুই কাম্য ছিল আমাদের। কিন্তু সুস্থ সেলগুলো ধ্বং
হয়ে গিয়ে এমন একটা জড়তা তৈরি হয়ে গেল না তো নানাভাইয়ের? কিংবা এই
মাঝে মাঝে ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠা—তুমিই বলছিলে, কাজের লোকদের মারধোর কর
হাত মুচড়ে দেয় নার্স-আয়ার—সেটা ঐ রে-র এফেক্ট নয় তো!

হতেও পারে। নট আনলাইকলি। আবার নাও হতে পারে। গায়ে তো এখন
অসম্ভব জোর। তোমার হাত যদি একবার ধরে নিতে পারে, তাহলে বাবা ইচ্ছে
করলে ছাড়িয়ে তুমি দূরে চলে যেতে পারবে না।

সে তো আমি দেখেছি। জানিও।

পা-টা সরু হয়ে গেছে বটে বাবার, না হেঁটে হেঁটে, চলাফেরা না করে করে। কি
হাতে অসম্ভব স্ট্রেংথ। তবে হাঁটতে না পারলেও পায়ে করে লাথি মারতে পারে।

ভায়োলেন্ট হলে—এই যে বলছ নানাভাই ভায়োলেন্ট হয়ে যায়, তখন কি ক
সে?

কি করে মানে? সাংঘাতিক সব কাজ করতে আরম্ভ করে। মার ধোর তো আছে
তারপর হাতে ইনজেকশান দেয়ার জন্যে যে চ্যানেল করা আছে, সেইটা উপড়ে তু
ফেলে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড।

প্রায়ই হয় নাকি এরকম?

হ্যাঁ, প্রায়ই হয়। শুধু ইনজেকশানের চ্যানেলই নয়, ক্যাথিটারও খুলে ফেলে। তারপর রেস্টলেস হয়ে ওঠে। ভীষণ রেস্টলেস। অস্থির। মাথার ডান দিকে কানের ওপর ঐ যে সার্জারির জায়গাটা, সেটা বেশ অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে ফুলে ওঠে তখন।

নানাভাই রেস্টলেস হলে অপারেশনের জায়গাটা ফুলে ওঠে?

হ্যাঁ। বেশ ফোলে। ওটার সাইজ দেখে বুঝতে পারি কিছু একটা কেলেঙ্কারি হতে চলেছে।

ক্যাথিটার পাইপ খুলে ফেললে তো বিপদ!

হ্যাঁ, যদিও কনডোম সিসটেমে লাগনো ক্যাথিটার। কিন্তু তাতেও কখনও কখনও রক্ত বেরিয়ে আসে। তাছাড়া পায়খানা-পেচ্ছাপ তো সব সময় বলতে পারে না। সেই জন্যেই ক্যাথিটার দেয়া। ক্যাথিটার খুলে দিলে যে কোনো সময় বিছানা ভেসে যেতে পারে। সেই পেচ্ছাপের মধ্যেই তো শুয়ে থাকবে। তার থেকে অন্য ইনফেকশান। বেডসোরের সম্ভাবনা তৈরি হওয়া—সবই হ'তে পারে। সেদিকটাও সামলে রাখতে হয়। এ কি একটা সমস্যা আঙ্কল! হাজার হাজার সমস্যা।

তোমরা দুই বোন আর দুই জামাই মিলেই তো সব সামলাচ্ছ। বাবাকে দেখছ। নার্সিং করছ। তার ওপর টাকা যোগাড় করা আছে। সেও তো বড় কম সমস্যা নয়। অনেক অনেক টাকা। আমরা তো কিছুই করতে পারি না।

যথেষ্ট কর আঙ্কল। যথেষ্ট। আবার কি করবে বল তো!

না, না। কিছুই পারি না আমি। কিছু না। এসময়ে তোমাদের পাশে আরও বেশি করে দাঁড়ান দরকার ছিল। নিজেই বুঝতে পারি যতটা প্রয়োজন ছিল, পারি নি। এ নিয়ে বলতে আমার কোনো লজ্জা বা সংশয় নেই।

তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম আঙ্কল।

কেন!

এই যে ফোনে এতক্ষণ এনগেজ করে রাখলাম তোমায়।

কি বলছ কি তুমি বেবি! কি বলছ এটা। নানাভাই আমার বিশেষ বন্ধু। তুমি তার সন্তান। বন্ধুর সন্তান তো এক রকম সন্তানই। সেখানে তুমি চরম বিপদের দিনে আমাকে দুটো চারটে কথা বলে মনের ভার হালকা করতে চাইছ, তাতে আমার সময় নষ্ট হবে! আমি বিরক্ত হব! এমন কথা ভাবতে পারলে তুমি! না, রোজি ডিয়ার—ওভাবে বোলো না। এরকম কথা বললে আমি কষ্ট পাই। সাংঘাতিক কষ্ট হয়। প্লিজ, এভাবে ভবিষ্যতে আর তুমি বলনা।

না, না আঙ্কল। তুমি অন্যভাবে নিওনা। আসলে আমার আর ছোটবোনের কথা বলার লোক কোথায় বলতো! মা বেঁচে থাকলে নয় মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বলে হালকা হতাম। সে উপায়ও তো নেই। ফলে আমি আর নওরোজি, আমাদের হাজব্যান্ডরা আর তুমি। এই তো কথা বলার লোক। বিশেষ করে বাবার বিষয়ে।

অন্যদের বললে তো ভাববে কি বলে একই কথা, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাবার অসুখ—বাবার অসুখ যেন আর কারও হয়না। অসুস্থ হয় না নাকি কারও বাবা! কেউ কেউ ভাবতেও পারে আমরা সিমপল সিমপ্যাথি আর পিটি যোগাড় করার জন্যেই বুঝি তাকে বাবার শরীর খারাপ নিয়ে বলছি। এই অসুখের কথা বলে পয়সা রোজগার—মোটা টাকা ধারের ফিকির খুঁজছি, এমনও ভাবতে পারে কেউ। এই সব ভাবনা চিন্তা থেকে আমি সব সময় থাউজেন্ড মাইলস দূরে থাকতে চাই। আর লোক দেখান পিটি, সিমপ্যাথি, করুণা—মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করতে করতে বলা, আহা-হা-বড্ড কষ্ট রে তোদের, আমার বিলকুল না-পসন্দ। শুনলেই দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে মাথার ভেতর।

না, না—তুমি বা নওরোজি, তোমাদের হাজব্যান্ডরা সে পাত্রই নয়, এ আমি খুবই ভালো করে জানি ডিয়ার। কিন্তু কি করবে বল—গাড্ডায় পড়ে গেছ তোমরা। সেখানে থেকে উদ্ধার তো পেতে হবে। দুঃসময় যখন শুরু হয়েছে, তখন শেষও হবে। এটা জেন, জীবনে যেমন গুড ডেজ পার্মানেন্ট নয়। তেমনি ব্যাড ডেজও নয়। আসলে পৃথিবীতে কিছুই পার্মানেন্ট নয়। স্থায়ি নয় কিছুই বাবা। তেমনি নিয়মেই গুড ডেজ চলে যাবে, ব্যাড ডেজ আসবে। ব্যাড ডেজ চলে যাবে, গুড ডেজ আসবে।

কিন্তু ব্যাড ডেজ তো আর শেষ হচ্ছে না আঙ্কল।

শেষ হবে বেবি। নিশ্চয়ই শেষ হবে। যার শুরু হয় তার শেষও হয়। আমাদের শেষ দেখার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

সব তো বুঝলাম আঙ্কল। কিন্তু শেষটা যে কী হবে!

কিছু একটা হবেই বেবি।

তোমার সঙ্গে কথা বলে ভরসা বাড়ে আঙ্কল। ফোন করলে ভালো লাগে।

করবে ফোন। কে মানা করেছে? যখন ইচ্ছে হয় ফোন করবে। আমিও খবর নেব ফোনে। চলে যাব। কোনো অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে। তোমায় বলা রইল।

জানাব আঙ্কল। জানাব।

ওকে। ওকে ডিয়ার।

তাহলে আমি এবার ফোন ছাড়ি আঙ্কল?

হ্যাঁ। ঠিক আছে।

তাহলে ছাড়লাম!

আচ্ছা। আচ্ছা।

ও প্রান্তে ফোন রেখে দেয়ার শব্দ।

ফোন নামিয়ে রাখলেন জামসেদ।

সত্যি সত্যি রোজি নওরোজিদের কোনো তুলনা নেই। কীভাবে কীভাবে নিজেদের সর্বস্ব পণ করে সেবা করে যাচ্ছে বাবার। হ্যাটস অফ। হ্যাটস অফ। দুই বোন তাদের হাজব্যান্ডরা—কোনো জবাব নেই।

নয়

আজও রাতে অন্য কোনো কোনো দিনের মতোই নিজের শোয়ার ঘরটা একটু একটু করে ছোট হয়ে এল জামসেদ ওয়াদিয়ার সামনে। এমন তো কত রাতেই হয়। তখন একা ঘরে রীতিমতো ভয় করে। মনে হয় চার দেয়াল চার দিক থেকে চেপে ধরে পিষে মেরে ফেলবে। আর ছাদটা সব সুদ্ধু নেমে আসবে মাথার ওপর! তাই মাথাটাও আর আস্ত থাকবে না। সে এক ভীষণ দমবন্ধ করা পরিস্থিতি। এমনটি যার না হয়েছে, সে বুঝবে না। ডাক্তার—মনোবিদ, কাউনসেলিং, ওষুধ—কিছুই বাদ যায় নি। তবু মাঝে মাঝে—কোনো কোনো রাতে এমনটি হয়। তখন উঠে বসে থাকতে হয় বিছানার ওপর! ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কী ভাবে যে রাত কাটবে বুঝে উঠতে পারি না। কল্পনার গুণে, দেয়াল টপকে, এক থেকে একশো, আবার উল্টোদিকে একশো থেকে এক গুনতে গুনতে ঘুম ডাকার যে সব চালু পদ্ধতি, সব ব্যর্থ। হাই ওঠে। চোখ জ্বালা করে। কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। আজও তেমনই ঘুম না আসার ফাঁদে পড়ে গেছেন জামসেদ ওয়াদিয়া। অনেকবার উঠে বেসিনে গিয়ে কল খুলে বার বার জল দিয়ে আসছেন মাথায়, ঘাড়ে। কিন্তু ঘুম আসার লক্ষণই নেই।

ঘুম তো আসছেই না। পাশাপাশি মনে হচ্ছে, আজই শেষ রজনী। দেয়ালেরা একটু একটু করে এগিয়ে এসে ঠিক পিষে ফেলবে আমায়। তারপর মাথার ওপর ছাদটাও আর থাকবে না জায়গা মতো। আস্তে আস্তে নেমে আসতে আসতে এক সময় ঝপ করে ভেঙে পড়বে মাথার ওপর। তখন কি হবে?

এমনটি ভেবেই জামসেদ ওয়াদিয়া মনের ডাক্তারবাবুর বলা কথা মতো নিজেকে সাজেশন দিতে থাকলেন, এ সবই অলীক। এর কোনোটারই কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। আমি যা দেখছি, যা শুনছি এখন—সবই মিথ্যে। এই মিথ্যের মোহে আমাকে পড়লে একেবারেই চলবে না—এমন সব অটো সাজেশান দিতে দিতে পড়ে যাওয়া দেয়াল আর ছাদের ভয় থেকে নিজেকে বার করে আনতে চাইলেন জামসেদ। কিন্তু এত সহজে কি মুক্তি ঘটে বিভ্রম থেকে? যত তাড়াতাড়ি অসুখ, অসুবিধে জেঁকে বসে শরীর-মনের ওপর, তত তাড়াতাড়ি কি তাদের উপড়ে ফেলা যায়, না ফেলা সম্ভব? ভাবতে ভাবতে আবারও দোতলায় শোয়ার ঘরের সবগুলো দেয়ালকে একটু একটু করে এগিয়ে আসতে দেখতে পান জামসেদ। ছাদটাও ঝুলে নেমে আসতে চাইছে। যদি দুম করে ভেঙে পড়ে মাথার ওপর! তখন!

ভয়ে গলা দিয়ে চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল জামসেদের। তেমন জোরে নয়। বিছানায় মাথার কাছে রাখা গুলিভরা কোল্ট তুলে নিয়ে জামসেদ ঠিক করলেন আর দেরি নয়, এবার ফায়ার করতে হবে এগিয়ে এগিয়ে আসা দেয়ালদের দিকে। যারা ক্রমশ চেপে, পিষে মারতে চাইছে তাঁকে। হাতে করে লোডেড কোল্ট তুলে নিলেন জামসেদ। ফায়ার করবেন ভাবছেন এমন সময় সমস্ত ঘর ভরে গেল চাঁদের আলোয়।

কি আশ্চর্য স্নিগ্ধ একটা রঙ চারপাশে। কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ঘুম ঘুম আমেজ দেয়ালরা কি পিছু হটল ক্রমাগত এগিয়ে আসা থেকে! মাথার ওপর ছাদটাও কি ভেঙে না পড়ে চুপচাপ হয়ে গেল! কেন হলো! কী ভাবে হলো এমনটি? জামসেদ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন।

রাত এখন কত হবে! চট করে মাথার কাছে রাখা দুটো টর্চের একটা টেনে এনে জ্বেলে হাতে বাঁধার 'কেমি'-তে সময় দেখলেন। রাত তিনটে বাজতে বারো। দম দেয় ঘড়ি। অনেক দিনের পুরনো। কিন্তু সঠিক সময় দেয়। সব সময় অ্যাকিউরেট। আর মিনিট দশ-পনের, কিংবা বড় জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ির দোতলা তিনতলা এব তলায় রাখা, দম দেয়া, পেন্ডুলাম দোলান দেয়ালঘড়িরা ঢং ঢং ঢং করে নিজেদের মতে বাজতে থাকবে। পরপর অনেকগুলো দেয়াল ঘড়ির শব্দ ফালা ফালা করে দেবে সমস্ত স্তব্ধতা আর সময়। ঠিক সময় ধরে মেলান হয় মাঝে মাঝে এদের। কিন্তু বহু বছরের পুরনো সব ওয়াল ক্লক। নিজেদের মতো স্লো, ফাস্ট হয়ে গিয়ে বাজতে থাকে। তখন কিছু করার থাকে না। কত বার মেলান যায়! আর কে-ই বা মেলায়! সব সময় ভালো লাগে নাকি একঘেয়ে কাজ করতে! এসব ভাবতে ভাবতেই জামসেদ ওয়াদিয়া ঘরের ভেতর ফুটে ওঠা জ্যোৎস্না দেখতে পেলেন। এ ঠিক আকাশ থেকে গড়িয়ে নামা চাঁদের আলো জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়েছে, এমন নয়। এ যেন ঘরের ভেতর গজিয়ে ওঠা চাঁদ। তার আলোয় দশ দিক আলো।

ডান হাতের তর্জনীটি আকাশের দিকে তোলা, মাথায় শাদা পাগড়ি। মেঘের আড়াল থেকে কিছু একটা ফুটে উঠলে যেমন হয়, বুঝি বা ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকা চেহারা। কিন্তু আবছা মতো অবয়বটি বোঝা যায়। আর সেই বোঝা না বোঝার মাঝে দাঁড়ান চেহারার বাঁ হাতে দীর্ঘ দণ্ড। সেই দণ্ডের মাথায় শিঙ সমেত গোমুখ। এঁকেই তো আমি বার বার দেখেছি। এখনও দেখি।

ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে নানাভাই মোদি যে কেবিন ভর্তি আছে, তার মাথার কাছে লম্বা জানলার ওপারে যে এবড়ো-খেবড়ো জমি, সেখানে একটি প্রাচীন বট। ঝুরি নামন সেই বটের ছায়াময়তায় তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আলো-আঁধারিতে বোনা সেই আশ্চর্য নকশায় তাঁকে দেখে ভালো লেগেছিল। ভরসা পেয়েছিলাম আজও রাতে, অন্য অনেক অনেক রাতের মতো, যখন শোয়ার ঘরের দেয়াল একটু একটু করে সরে এসে প্রায় আমার গায়ের ওপর পড়তে চাইছে। পাশাপাশি এমনও মনে হচ্ছে ছাদ যেন নেমে আসবে মাথার ওপর, তখন আলোর বান ডাকিয়ে তিনি এলেন ভেতরটা ভরে গেল জামসেদ ওয়াদিয়ার। এই ঘরের চেপে বসতে আসা দেয়ালের ছাদ—সবাই যেন একটু একটু করে সরে গেল।

হে ঐর্যানামের তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ, জরথুশত্র—আপনি আপনার পবিত্র জীব

কথা, যাহা পূর্বে আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা পুনরায় বলিতে শুরু করিলে আমি যারপরনাই আহ্লাদিত হইব। অবশ্য যদি আপনি কৃপা করেন।

সেই প্রায় মুখ মুছে যাওয়া শরীর, যেন যা ফিকে কুয়াশার আড়াল থেকে বলে উঠলেন, নিজের কীর্তি-কাহিনীর কথা নিজ মুখে বলিতে নাই। ইহাতে চিত্তের শুদ্ধ ভাব নষ্ট হয়।

জামসেদ সেই দেখা না-দেখার মাঝে দাঁড়ান আলো দেয়া মানুষটির গালে ঘন, দীর্ঘ কালো দাড়ি দেখতে পেলেন। যেমন সাধারণ ভাবে প্রাচ্যের বহু ধর্ম প্রচারকের হয়। তাঁর চোখ দুটিও বেশ বড়, টানা টানা আর বুদ্ধিদীপ্ত।

হে মহান জরথুশত্র, আমি বাহাত্তর পার করিয়া তিয়াত্তরে পড়িয়াছি। স্ত্রী, সন্তানেরা কেহ নাই। সকলেই পৃথিবীর মায়া কাটাইয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরদার তৈয়ারি এই বিশাল তিনতলা বাড়ি ও তাহার সংলগ্ন সাত কাঠা জমি প্রোমোটারের লোকেরা লইবার নিমিত্ত নিয়ত আমাকে আতঙ্কিত করিবার প্রয়াস চালাইতেছে। দু-তিন বার আমার উপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হইয়াছে। কোনো ক্রমে এক চুল আধ চুলের জন্য প্রাণে বাঁচিয়াছি। এখন মরিতে আর ভয় হয় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপনার জীবনকথা ও জরথুশত্রীয় ধর্মের বিবরণ শুনিলে মানসিক ক্লান্তি অপনোদন হয়। আমি অবগত আছি, জোরোআস্তের মুল ইরানি নামের রূপান্তর জরথুশত্র। জোরোআস্তের—জরথুশত্র। আপনি ঐর্যানামের (এখনকার ইরান) আর্য ধর্ম সংস্কারকদের গাথা সমূহের মাধ্যমে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। গাথার ভাষা সমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ করিয়া বিশেষজ্ঞগণের কেহ কেহ আপনার আবির্ভাবের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বৎসরেরও পূর্বে বলিয়া নির্ণয় করেন।

সেই মেঘলা শরীরের থেকে উঠে আসা কথা শুনতে শুনতে জামসেদ দেখতে পেলেন পশ্চিম ইরানের মিডিয়া বা মদ নামের প্রদেশে জন্মান শিশু জরথুশত্র খেলা করছেন আরও অনেক ছোটদের সঙ্গে।

শৈশবে গোত্রানুসারে আমি স্পিতম (সংস্কৃত 'শ্বিতম', 'শ্বেত') এই নামে পরিচিত হই। আমার পিতা ছিলেন রাজবংশজাত। তিনি প্রবেশ করেন পুরোহিত গোষ্ঠীতে। আমার পিতৃদেবের নাম পৌরুষসপ।

জানি প্রভু। পুরু ও অশ্ব মিলে পৌরুষসপ্ (= পুরু+অশ্ব) মাতৃদেবীর নাম 'দুঘদ-হেবা'—মানে দুগ্ধবতী গাভী। আপনার স্ত্রীর নাম হেবাস্বো, যার অর্থ গবী। এ সবই গ্রন্থ পাঠ পূর্বক আমি জ্ঞাত হইয়াছি। আপনার নাম তো জরথুশত্র। সংস্কৃতে 'জরদ-উষ্ট্র', যাঁহার বৃদ্ধ উষ্ট্র রহিয়াছে, এমন ব্যক্তি। 'জরদ-গব' শব্দটির সহিতও ইহার তুলনা চলিতে পারে। আপনি আপনার ঔরসদাতা পিতৃদেব, গর্ভধারিণী মাতৃদেবী, আপনার সহধর্মিণী—সকল জনের ব্যক্তি নাম ব্যবচ্ছেদপূর্বক হয়ত বা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় আপনাদিগের পরিবার কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং আপনাদিগের পরিবারবার্গের গো-মহিষাদি পশুসম্পদ ছিল।

সেই আলো বিকীরণ করা শরীর জামসেদের এই সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, জরথুশত্র—এই নামের অন্য ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। জরথ শব্দের অর্থ স্বর্ণময় অথবা প্রোজ্জ্বল এবং 'উষ' ধাতু জাত উষত্র শব্দের অর্থ উষার কিরণ।

শুধু তাহাই নহে, জরথুশত্র নামের ভিন্ন ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। যিনি প্রদীপ্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই জরথুশত্র। তাঁহার নামের অর্থ ঈশ্বরানুগৃহীত তত্ত্বজ্ঞান। বলতে বলতে জামসেদ দেখলেন তাঁর ঘর থেকে সেই ভালো লাগা জ্যোৎস্না কখন যেন মিলিয়ে গেছে। তার বদলে নিজের মৃত বড় ছেলেকে অন্য অন্য দিনে যেমন দেখেন, তেমনই দেখতে পেলেন জামসেদ।

ঘরের এক কোণে জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে।

তার শরীর তেমন স্পষ্ট নয়। ধোঁয়ার তৈরি কিছু একটা। দেখা যায় কিন্তু ধরা যায় না।

কিছু বলবে?

তোমার সঙ্গে কথা বলতেই তো আসি বারবার।

আমার বড় কষ্ট হয় তোমাকে দেখলে। সব মনে পড়ে যায়। তুমি কথা বল। কিন্তু তোমায় তো কিছুতেই ছুঁতে পারি না। বুকে জড়িয়ে আদর করতে পারি না। গায়ে হাত বোলাতে পারি না। যেমন তোমার সারা গায়ে ছোটবেলায় হাত বোলাতাম। ফলে দুঃখ বাড়ে। দীর্ঘশ্বাস জমা হয় বুকের ভেতর।

কষ্ট কি আমারও হয় না! খুব কষ্ট হয়।

তাহলে বার বার আসে কেন?

ঐ যে, চোখের দেখা, মনটা একটু ভালো হয়।

তাই? আমারও তো মনটা কষ্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রসন্নতায় ভরে যায়।

সত্যি?

সত্যি।

তাহলে এস, অন্যদিনের মতো আজ আমরা একটু কথা বলি।

বল।

তোমার সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল সেই জ্যোৎস্নায় তৈরি মানুষের।

সে সব নিয়েই আজ তুমি কিছু বলবে?

হ্যাঁ। তাই তো ভাবছি।

বেশ তাই বল। আমি সেই অমৃতকথা শ্রবণ করি।

গ্রিক ভাষায় তাঁহার নামের যে বিকৃত রূপ প্রচলিত ছিল, তাহার শেষ অংশ আস্তের। ইহার অর্থ হইতেছে তারা। ইহাও তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতির পরিচায়ক।

নিজেদের মৃত ছেলের মুখে মহামানব জরথুশত্রর কথা শুনতে শুনতে জামসেদ

য়াদিয়া দেখতে পেলেন পনের বছর বয়সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন জরথুশত্র। চলে
ালেন সোজা উশিদারায়ণ পাহাড়ে।

উশিদারায়ণ পর্বতে তিনি তপশ্চর্যার রত হইলেন। দীর্ঘ পনের বৎসর সেই তপস্যা
ইল। সেস্থানে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরমেশ্বর অহুর মাজদা তাঁহার সমক্ষে
..ত্মপ্রকাশ করিলেন।

অহুর মাজদা মানে আলোর দেবতা। উশিদারায়ণ পাহাড়ে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন অহুর মাজদা। জামসেদ বহুবার শোনা কাহিনীর নানা সুতো জুড়ে জুড়ে ছবিটাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

উশিদারায়ণ পর্বতে তিনি ঈশ্বর দত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রচার কল্পে তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করেন। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে প্রভূত নির্যাতন ভোগ করিতে হয়।

যখন জরথুশত্রর বেয়াল্লিশ বছর, তখন তিনি পূর্ব ঐর্যানামের বালহিকে পালিয়ে গিয়ে বিষতাসপ বা বিষ্টাশ্ব নাম নিয়ে রাজা আর তাঁর রানী হুতোবার দরবারে উপস্থিত হন।

জামসেদ জানেন সেই বালহিক প্রদেশে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। বেয়াল্লিশ থেকে সাতাত্তর—এই সময়টা তিনি ছিলেন বালহিকেই।

জরথুশত্র প্রচারিত ধর্মের মূল কথা হইল অহুর মাজদা নামে এক পরমেশ্বরে বিশ্বাস। পারশিক বা জরথুশত্রিয় যাহাকে জরস্তোতি ধর্মও বলা হয়, আদি নাম মজদা-য়সন। বস্তুত পারসিক বিশ্বাস মতে জগতে ইহা সর্বপ্রথম প্রচারিত একেশ্বরবাদ। ইন্দো-ইরানিয় আর্যগণ সূর্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া দেবতা জ্ঞানে তাঁহাদের পূজা করিত। তাঁহারা মনে করিতেন ঐ সকল দেবতা উর্ধ্বে অবস্থিত স্বর্গ-হইতে মানুষের কার্য-কলাপ ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরে ক্রমশ এই ধর্মাচরণের মধ্যে কুসংস্কার, পূজা বা যজ্ঞে পশু বলিদান এবং নানা প্রকার উৎপীড়ন প্রবেশ করে। তাহাতে জরথুশত্র প্রচারিত ধর্ম তাহার স্বকীয় বৈশিষ্ট হইতে বিচ্যুত হয়। করপন ও উসিজ নামে পুরোহিতগণ এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড হইতে লাভবান হইতে থাকে এবং 'কবি' নামে পরিচিত শাসক প্রভুগণকে, হানা দিয়া গোহরণ ও যজ্ঞে পশুবধ এবং প্রজার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও তাহাদের প্রতি নানা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত করে।

এসব শুনতে শুনতে জামসেদ ওয়াদিয়ার মনে পড়ল প্রাচীন ঐর্যানামে শাসক-প্রভুদের বলা হত 'কবি'। আর অধঃপতিত ধর্ম যাজক-পুরোহিতদের বলা হত করপন এবং উসিজ। এই করপন ও উসিজরা কবিদের নানা ভাবে তাতাচ্ছে প্রজাপীড়নের ব্যাপারে।

প্রজাদের গোরু হরণ করে নিয়ে আসছে 'কবি'। যজ্ঞে বলি হচ্ছে পশু। যার সঙ্গে অহুর মাজদার ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই।

জরথুশত্র আবির্ভূত হলেন গোধনের রক্ষক হিসেবে। তিনি অন্যতম সমাজসংস্কারক, শাসকবর্গের নেতা ও শিক্ষাগুরু।

নিজের মৃত সন্তান জাহাঙ্গীরের কাছে এসব শুনতে শুনতে চোখ জ্বালা করতে লাগল জামসেদের। রাত অনেক হয়েছে। একটু ঘুমোতে পারলে আরাম হত। ভাবতে ভাবতেই বড় করে হাই উঠল তাঁর।

বিছানায় শুয়ে পড়ার পর দেয়ালেরা আর এগিয়ে এল না তাঁর দিকে। ছাদও ভেঙে নামতে চাইল না মাথার ওপর। চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইলেন জামসেদ। ঘুম একটু একটু করে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

জাহাঙ্গীর বলল, এবার আমি যাই।

জামসেদ ঘাড় নাড়লেন। বললেন, ঠিক আছে। তারপর একটু থেমে বললেন, আবার কবে আসছ?

এ কথার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

দশ

গুজরাটের থেকে এক কিলোমিটার দূরে, এক কিলোমিটারও নয়, ঠিক করে মাপলে তারও কম, সেই ভিলবাদি গ্রামে পুরনো ডাল থেকে শেকড় গজিয়ে নতুন আমগাছ হয়ে ওঠার ছবি ঘুমের মধ্যে ভেসে এল জামসেদ ওয়াদিয়ার। গাছের ডাল নিচু হয়ে মাটি ছুঁল। তারপর শেকড় গজাল তার গায়ে। নতুন গাছ নব উদ্যমে বড় হতে লাগল তার থেকে ডাল বেরিয়ে বড় হয়ে ছুঁয়ে ফেলল মাটি। সেখান থেকে আবার নতুন গাছ

সেই বুক বেয়ে বেয়ে এগিয়ে চলা গাছ এখন বিপন্ন। ভাইপো ফিরোজ ফোনে জানিয়েছে। খবরও বেরিয়েছে কাগজে গাছের ছবি দিয়ে। সেই প্রায় লাতিয়ে চলা আমগাছের স্বপ্ন দেখতে দেখতে জামসেদ ওয়াদিয়া ঘুমের সময় পার করছিলেন তারপর খানিকটা সময় এভাবে পেরিয়ে যেতে যেতে তিনি সেই ডাল নিচু করে, প্রায় লতিয়ে গিয়ে শেকড় বার করা আম গাছটিকে নিজের বুকের মধ্যে নতুন করে বেড়ে উঠতে দেখলেন। নবীন গাছের ডালে ডালে আমের বউল। সেই জেগে ওঠা মুকুল- গন্ধ মাথার ভেতর ঢুকে পড়লে পাগল পাগল অবস্থা তৈরি হয়ে যায়। এই আবছ ঘোরের ভেতর সমুদ্র পথে পাল তোলা, দাঁড় বাওয়া কাঠের নৌকোয় কাথিয়াওয়াড় থেকে হরমুজ বন্দরের দিকে যাত্রা করলেন জামসেদ।

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আরব হানাদাররা ঐর্যানাম দখল করে নেয়ার পর কোহিস্তানের দুর্গম পাহাড় আর গুহার অন্ধকারে হারিয়ে গেছিল অগ্নি-পূজকরা। নিজেদের সংস্কৃতি আর ধর্ম বাঁচানোর জন্য তারা সেই পাহাড়ে, গুহায় লুকিয়ে ছিল বছরের পর বছর তারপর ৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে—আরব আক্রমণের একশো পঁচিশ বছর পর কোহিস্তান থেকে বেরিয়ে এসে তারা হরমুজ বন্দর থেকে রওনা দিয়েছিল কাঠের নৌকোয়, সমুদ্র পেরিয়ে আসতে চেয়েছিল ভারতবর্ষে।

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। সেই আকাশ দেখে, তার থেকে নক্ষত্র চিনে বাছাই করে দিক ঠিক করা। মাসের পর মাস চলা নোনা জল পেরিয়ে, সাগর ভেঙে।

ঘুমের ভেতর হরমুজ বন্দরের দিকে ফিরতে চাইলেন জামসেদ। বাতাসে নোনা গন্ধ। পালতোলা কাঠের নৌকো ঢেউ ভাঙছে সমুদ্রের।

হরমুজ পৌঁছে আবার যদি ফিরে যেতে পারি কোহিস্তানের পাহাড়ে, গুহায়। ভাবতে ভাবতে বড় নৌকোয় সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছিলেন জামসেদ।

নৌকোর পাটাতন দাঁড়িয়ে পথ দেখান নক্ষত্রের দিকে তাকাতে তাকাতে তিনি শুনতে পেলেন—

জরথুশত্র ঘোষণা করিলেন যে, অহুর মজদা হইলেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। প্রকৃতির অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু ও শক্তি তাঁহার সৃষ্টির নিয়মের বা ধর্মের অধীন। যে নিয়ম বা ধর্ম আদি আর্য ভাষায় 'ঋত' রূপেই বিদ্যমান। এবং ইরানে প্রাচীন পারসিক ভাষায় ইহার রূপ হইতেছে অর্ত ও অবেস্তা বা আবেস্তার ভাষায় অব। অহুর মজদা বা মাজদা সংস্কৃতে অসুর মেধস। যার মানে করলে দাঁড়ায় শক্তিময় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর।

বড় নৌকোটি ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলছে অন্ধকার রাতে। মাঝ দরিয়ায় অবশ্য তেমন তরঙ্গ নেই। কিন্তু সেই ভয় দেখান বিশাল জলরাশির কোনো তলকূল নেই। কিনারাও না। এপার-ওপার কিছুই দেখা যায় না। দিগন্তহীন জল, শুধু জল পেরিয়ে কয়েকটি পালতোলা নৌকো দাঁড়ের ঘায়ে জল কেটে কেটে ফিরে যেতে চাইছে হরমুজ বন্দরের দিকে।

জামসেদ বড় নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনতে পেলেন, ঈশ্বর মানব জাতির মনে চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন। মনুষ্যদিকে 'স্পেন্ত মইন্যু' (শুদ্ধ শক্তি) এবং অঙ্গ্রমইন্যু (অসৎ শক্তি)—এই দুই শক্তির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইয়া চলিতে হয়। সৎ পথে চালিত মানুষের পক্ষে ছয়টি অমেষ স্পেন্ত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক। এই ছয়টি হইতেছে—বোহুমনো, অষ, খ্‌ষত্র, আরমইতি, হউর্বতাৎ, অমরেতাৎ। সংস্কৃত ভাষায় বলিতে গেলে যথাক্রমে আসিবে বোহুমনো—বসু মনস বা শ্রেষ্ঠ মনন, অষ-ঋত অর্থাৎ সত্য ও সত্যতা। খ্‌ষত্র—ক্ষত্র অর্থাৎ দৈবশক্তি, আরমইতি—ভক্তি, ঈশ্বরে, অনুরাগ, হউর্বতাৎ-সর্বতাৎ অর্থাৎ পরিপূর্ণতা, অমরেতাৎ—অমৃতাৎ বা অমরত্ব। এইগুলি প্রত্যেক ধর্মগ্রাহী ব্যক্তির সাধনা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত। জীবৎকালে তিনটি নীতি পালন করিত মানুষ। হুমত, হুখত ও হুর্স্ত। সংস্কৃতে সু-মত, সু-উক্ত, সু-বৃক্ত। অর্থাৎ শুভ মনন, শুভ বচন বা কথন এবং শুভকর্ম। মানুষ সর্বদাই এগুলি পালন করিবে।

কোথায় কোথায় সেই মানুষ—যারা শুভমনন, শুভবচন আর শুভকর্ম—সব সময় করে যাচ্ছে। বেশ জোরেই বলতে বলতে ভেসে যাওয়া নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে দু হাত তুলে জানতে চাইলেন জামসেদ।

সময়টা কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে চাঁদ ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছে। তারাদের আলোতেই

যতটুকু আলো। শেষ রাতের দুবলা পাতলা চাঁদের আলোর সর পড়ে আছে দরিয়ার জলে। সেই আলোয় কি এক মায়া, বিভ্রম তৈরি হয় বুঝি।

জামসেদের মাথায় এখন শাদা পাগড়ি বাঁধা। গাল ভর্তি কালো দাড়ি। গোঁফ। কুস্তি ও সদবা রয়েছে গায়ে। ঢিলে ঢালা শাদা জামা পরেছেন তিনি, প্রায় পা অব্দি। সেই আলগা আলগা পোশাকের বুকের ওপর ডাল-পালা মেলে জেগে আছে গুজরাটের সনজান শহর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ভিলবাদি গ্রামের সেই প্রাচীন আম্র বৃক্ষটি, ছবি হয়ে। যে আমগাছ বুকে হেঁটে হেঁটে শেকড় ছড়াতে ছড়াতে এগোয় এক জমি থেকে অন্য জমিতে। কোনো সীমানা মানে না। মালিক মানে না।

জামসেদের জামার বুকে ডাল পাতা মেলে সেই আমগাছের ছবি কথা বলে ওঠে হরমুজ বন্দর থেকে যখন অগ্নি-পূজকরা আকাশের তারার দিকে চোখ রেখে রেখে সুমদ্রপথে পুবের দেশে রওনা হয়েছিল, তখন তাদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। গুজরাটের সনজানে এসে বসত করার পর সেই গাছ—আমের গাছ ছিল তাদের কাছে জন্মভূমির স্মৃতি। কিন্তু সেই গাছও তো এখন কাটা পড়তে চলেছে। অন্তত খবরের কাগজে সেরকমই খবর বেরিয়েছে।

তাই তো তোমায় বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি কোহিস্তানে। সেখানে লাগিয়ে দেব তোমায়।

এতো ছবি। ছবি থেকে কি জ্যান্ত গাছ গজায়?

কে বলল গজায় না! বিশ্বাস থাকলে ছবিও নড়ে চড়ে। জীবন্ত হয়।

চারপাশ থেকে তখনই উড়ে আসা আমের মুকুলের ফিকে সুবাস পেতে লাগলেন জামসেদ। সুন্দর গন্ধ। সমুদ্রের এক ঘেয়ে নোনা ঘ্রাণ খানিকটা বুঝি সরে গেল এবার।

আকাশবাণী হয়ে ভেসে আসা কথা আবারও জামসেদকে মনে করিয়ে দিল, এই জীবন নশ্বর। জীবন এক দিন সমাপ্ত হইবেই। কিন্তু জীবন শেষ হইলেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে না। জীবন শেষ হইয়া গেলে মানুষের উর্বন বা আত্মা সুবিচার লাভ করিয়া পাইরিদ এজ্র—স্বর্গলোক লাভের পুরস্কার প্রাপ্ত অথবা নরকের শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেক যুগ বা কালচক্রের আর্বতন অন্তে ফ্রষোকেরেতি বা পুনর্জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। পরবর্তী যুগে মানুষের পথ নির্দেশের জন্য অপর এক 'সওষ্যন্ত' বা ত্রাণ কর্তার আবির্ভাব হয়। তিনিই জরথুশত্র।

সমুদ্র আশ্চর্য স্থির।

মাথার ওপর কৃষ্ণপক্ষের তারা ফোটা আকাশ। সেইদিকে তাকিয়ে কত কি মনে পড়ে যাচ্ছে জামসেদের। হাজার হাজার বছরের অগ্নি-উপাসনা। আগুন-দেবতার আরাধনা। নৌকোর ছাউনি ঢাকা জায়গার বাইরে খোলা পাটাতনে জামসেদ দেখতে পেলেন তাঁর বড় ছেলে জাহাঙ্গীরকে। সঙ্গে বাবা আর্দেশীর! ঠাকুরদা জাহাঙ্গীরকেও নিজের ঠাকুরদা আর ছেলের নাম এক—জাহাঙ্গীর। জামসেদের মনে পড়ল। ইচ্ছে

:রেই ঠাকুরদার নামেই ছেলের নাম রেখেছিলেন। শুধু ছেলে, বাবা বা ঠাকুরদা নয়। [ড়ো ঠাকুরদা—তস্য তস্য তস্য বুড়ো ঠাকুরদারাও হয়ত দাঁড়িয়ে আছে নৌকোর ওপর, ফাঁকা জায়গাটিতে। আর সেই তিনটি পাখি—যারা ওয়াদিয়া ম্যানসন-এর ঠোনে গাছপালার আড়াল থেকে হঠাৎ হঠাৎ টু-হি, টু-হি, টু—হি বলে ডেকে ওঠে, সেই পাখিদের দেখা যায় না চট করে কিন্তু সবুজের ঢাকনা সরিয়ে সামনে এসে পড়লে তাদের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। হাত খানেক লম্বা পাখি। কি তার রঙবাহার! তারা গায়ে উজ্জ্বল কমলা রঙের পালক। গলায় গোল করে আঁকা একটি কালো দাগ। ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল! মাথায় কালো ঝুঁটি। দু চোখও লাল।

অসাধারণ রূপবান তিনটি পাখি সকালের দিকে কখনও কখনও নেমে আসে ওয়াদিয়া ম্যানসন-এর সবুজ ঘাসে ছাওয়া উঠোনে। ঘুরে ঘুরে গান গায় তারা। গাইতে গাইতে কথা বলে ওঠে।

তিনতলা ওয়াদিয়া ম্যানসন-এর উঠোনে মেহগনির ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে এই রঙবাহারি তিনটি পাখির নাচ হামেশাই দেখতে পান জামসেদ। আজ তারা এসে হাজির হয়েছে কোহিস্থান যাওয়ার নৌকোর ওপর। কি যে অদ্ভুত লাগছে! আবার লাগছেও না। জামসেদ শুনতে পেলেন পাখি তিনটে পরিষ্কার মানুষের ভাষায় পব পর বলে যাচ্ছে—

জরথুশত্রর পাঁচটি গাথায়—যাকে বলা যেতে পারে আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধিময় বাণী, সেই সব গাথায় প্রকাশ পেয়েছে ধর্মবিশ্বাসের। এই বিশ্বাস জরথুশত্র ধর্মের। অহুর মজদার প্রসাদে ঋষি জরথুশত্রর নিকট প্রকাশিত এই নূতন ঐশ্বরিক বিধান যাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে মজদায়সনান আখ্যা দেয়া হইল। আর যাঁহারা প্রাকৃতিক শক্তির আধারে কল্পিত দেবতার পূজা লইয়া পুরাতন ধারা ধরিয়া রহিল তাঁহারা দ-এব-যসনান অর্থাৎ দেব পূজক নামে পরিচিত হইল।

দেব শব্দ এখানে দানববাচক। মানুষের গলায় বলতে থাকা পাখিদের মধ্যে কথা বলে উঠল কে যেন। জামসেদ কথা শুনে বুঝতে পারলেন এই গলা তাঁর মৃত পুত্র জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়ার। যদিও ঠাকুরদা জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়াও আছেন এই নৌকোয়।

জাহাঙ্গীর আবারও বলে উঠল, দেব শব্দের মানে কিন্তু এখানে হচ্ছে দানব।

তাইতো। তাইতো—এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল পাখিরা। তারপর একটু থেমে আবার বলল, আমরা সবাই জানি মজদা ধর্মানুষ্ঠানে বলিদান, মূর্তি পূজা অথবা কর্মবাদের কোনো স্থান রইল না। ইহার একেশ্বরবাদের তত্ত্বগুলি বিশ্বের চিন্তারাজ্যে প্রভাব বিস্তার করে। মজদা-যস্ন ধর্মের স্বর্গ ও নরকের কল্পনা ইহুদি ধর্মে ও তদনুসরণে খ্রিস্ট ধর্মে ও পরে ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এক স্রোত তো আর এক স্রোতে মেশেই। এটাই তো স্বাভাবিক। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর কথা বললেন জামসেদ।

তাতো ঠিকই, তাতো ঠিকই—এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠল পাখিরা। সব

স্রোতই যদি এক হবে, তাহলে কেন এত ভাগাভাগি, লড়ালড়ি, বিভেদ—এটুকু যেন বা নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন জামসেদ।

ওতো ধান্দাবাজরা তৈরি করে, নিজেদের সুবিধে মতো—পাখিরা কেমন এই কথাটি দিব্যি চলতি ভাষায় বলল, ভাবতে ভাবতে জামসেদ আবারও রাতের আকাশের দিকে তাকালেন। সেখানে তেমনই অজস্র তারার মেলা। তাদের ফুটি ফুটি আলোর কণা মিলেমিশে সমস্ত আকাশ একেবারে আলোয় আলো।

পাখিদের কণ্ঠে ফুটে উঠছে মহামতি জরথুশত্র প্রবর্তিত ধর্মের নানা সমাচার। —গাথায় রহিয়াছে মৃত্যুর পর মানবাত্মাকে ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার নিমিত্ত 'চিনবৎ পেরেতু' নামক সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। এই ধারণাই হয়ত বা ইসলাম ধর্মে 'পুল সিরাত সেতু'-র রূপকল্পে মিলিয়া যায়। গ্রিক ও রোমক দর্শন কোনো কোনো বিষয়ে ঐর্যানামিয় ধর্মবিচার হইতে অনুপ্রেরণা পায়।

ঋষি জরথুশত্রর মহাপ্রয়াণের পর তাঁহার পুত্র প্রধান আথ্রবান বা ধর্মনেতা এবং পুরোহিত হইলেন। মগ নামে পরিচিত পুরোহিতগণ এই ধর্ম জনগণের মধ্যে প্রচার করেন। তাহার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের ভার এই মগ নামধারী পুরোহিতদের হস্তে ছিল।

কিন্তু ঋষি জরথুশত্রর মহাপ্রয়াণ—নিজের ভেতর বলতে বলতে ফুঁপিয়ে উঠলেন জামসেদ। কষ্টে, গ্লানিতে, যন্ত্রণায় জামসেদের ভেতর থেকে দীর্ঘ এক কান্না পাক খেয়ে খেয়ে বুক হয়ে উঠে আসছে গলার কাছে। নক্ষত্র শোভায় ছয়লাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে বাহাত্তর পেরন জামসেদ ওয়াদিয়া কি জানি কি খুঁজলেন। তাঁর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামল।

সেই তারা ভরা আকাশের দিকে এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে পড়ল, ঋষি জরথুশত্রের যখন বেয়াল্লিশ, তখন তিনি পূর্ব ইরানের বালহিক বা বাকাটিয়া থেকে পালিয়ে এসে কবি বিষতাসপ বা বিষ্টাশ্ব নাম নিয়ে রাজা ও তাঁর রানী হুতোবার দরবারে হাজির হন। সেই বালহিকে তিনি বেয়াল্লিশ থেকে সাতাত্তর—এই পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। সাতাত্তর বছর বয়েসে—ঋষি জরথুশত্রর তখন সাতাত্তর—আমার থেকে ঠিক বছর চারেকের বড় উনি, তুরব্রাতুর নামে একজন তুরানি ধর্মান্ধ তাঁকে খুন করল বালখ বা বালহিকের অগ্নিমন্দিরে।

স্বপ্নে ভেসে চলা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে কূলহীন সাগর জলের ওঠা-পড়া দেখতে দেখতে জামসেদ যেন বা বালহিকের আগুন-মন্দিরে মহামতি জরথুশত্রর নিহত হওয়ার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলেন।

আততায়ীর ধারাল ভল্ল কিংবা অসি হঠাৎই বিদ্যুৎ রেখা হয়ে ঝলসে উঠল অগ্নি মন্দিরের বাতাসে। অস্ত্রাঘাতের পর রক্তে মাখামাখি জরথুশত্র কি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন? তাঁর সেই ক্ষমাশীল দীর্ঘ দুচোখ কি তখনও তেমনই ক্ষমা-নন্দিত ছিল। ডান হাতের তর্জনী কি উঠে ছিল আকাশ পানে? আর বাঁ হাতের সেই অলৌকিক

দণ্ডটি, সেটিও কি ছিল হাতে, না ছিটকে দূরে? ভাবতে ভাবতে জামসেদ আবারও তাঁর চোখের জল মুছলেন।

তখন মহামতি জরথুশত্রর মাথার শাদা পাগড়ি গায়ের শাদা আলখাল্লা সবই কি ভিজে উঠেছিল রক্তে? আস্তে আস্তে কি বদলে গেছিল তাদের রঙ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে জামসেদ ওয়াদিয়া আবারও সাজান নক্ষত্রদের দেখতে পেলেন। তারপরই সেই ছুটে যাওয়া নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর চোখের সামনে নতুন করে অগ্নি-মন্দিরের ভেতর জরথুশত্রকে হত্যার ছবি আবারও ভেসে উঠল। অর্বাচীন তুরানি ঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন জরথুশত্র। তাঁর নিথর দেহটি পড়ে আছে মাটিতে।

জরথুশত্রর ছিল তিন কন্যা, তিন পুত্র—সেই রঙবাহারি পাখিটি ডেকে ডেকে বলে উঠল এবার। —তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মগ নামে জরথুশত্রিয় পুরোহিত সম্প্রদায় তৈরি করেন। খ্রিস্ট জন্মের দুই-এক শতকের মধ্যে এই মগগণ আগমন করেন ভারতবর্ষে। ইহরা মগ-ব্রাহ্মণ বা শাকদ্বীপিয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। ইঁহারা ছিলেন জ্যোতির্বিদ। বলতে বলতে সেই সুন্দর পাখিরা পায়চারি করে নৌকোর ওপর।

মগ শব্দটি গ্রিকে Magos লাতিনে Magus। বহুবচনে Magi রূপে গৃহীত হয়।

কে, কে বলল একথা? গলা শুনে তো মনে হলো আমার মৃত বড় সন্তান জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়া। নিজেকে নিজেই এসব শোনালেন জামসেদ।

পশ্চিম য়ুরোপে Magi শব্দের অর্থ প্রাচ্যের জ্ঞানী। এই মগগণ ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতো ইরানের ধর্মচিন্তা, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সভ্যতা ও সর্ববিধ উন্নয়নে অগ্রণী ছিলেন। ভারতের পার্শি সম্প্রদায়—মানে আমরা যারা ঋষি জরথুশত্রের অনুগামী—তাদের পুরোহিতদের দস্তুর ও মোবদ অর্থাৎ মগপতি বলা হয়। এটুকু বলে সেই বাহারি পাখিদের একজন থামল।

পাখিরা, জাহাঙ্গীর—সবাই কত কি বলে যাচ্ছে। আর তখনই আবারও জরথুশত্রের অগ্নি মন্দিরে নিহত হওয়ার ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলেই ভেতরে ভেতরে ফুঁপিয়ে উঠছেন জামসেদ। তাঁর চোখে অবিরল ধারায় জল চলে আসছে। নোনা জল গড়িয়ে পড়ছে গালে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে, এই নোনা ধারায়। তার ঢিলে ঢালা শাদা জামার বুকে ছবি হয়ে জেগে থাকা সনজানের সেই বুক বেয়ে বেয়ে সামনে এগোন আম গাছটিও যেন ঋষি জরথুশত্র হত্যার ছবি দেখতে পেয়ে ডাল-পাতা শিকড় নেড়ে হায় হায় করে উঠল। সেই হায় হায় কি ছড়িয়ে পড়ল হরমুজ বন্দরের দিকে ফিরতে চাওয়া নৌকোর বাতাসে? তাদের সেই হাহাকারে কি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আকাশের নক্ষত্ররা? তারাদের কান্না কি টুপটাপ করে ঝরে পড়ল তরণীর ওপর? সেই তারা খসা জলের স্পর্শে কি একটু যেন শিউরেই উঠলেন জামসেদ? নাকি সমুদ্র-বাতাস তাঁকে ছুঁয়ে গেলে এক আশ্চর্য শিহর তৈরি হলো তাঁর সারা দেহে?

মাথায় ওপর নীলিমায় স্থির নক্ষত্রেরা তেমনই নির্বাক রইল। যেমন ছিল একটু আগে।

কিন্তু নৌকোয় আসা পাখিরা তো থামে নি। তারা আবারও কথা বলে উঠল। পূর্বেই বলিয়াছি, ঋষি জরথুশত্রর প্রয়াণের পর তাঁহার পুত্র প্রধান ধর্মনেতা বা আর্থ্রবান বলিয়া পরিচিত হইলেন। মগ নামে পরিচিত এই পুরোহিতগণ এই অগ্নিপূজা বিষয়ক ধর্ম জনগণের ভিতর প্রচার করেন। তাহার প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে এই মগদের হাতেই। তাঁহারা অবেস্তার ধর্মগ্রন্থবলী-যথা য়সন, বেন্দিদাদ, য়ষৎ প্রভৃতি এবং জরথুশত্রের গাথা অনুসারে দার্শনিক বিচার, ধর্মাচারবিধি ও প্রার্থনাবলীর সংরক্ষণ করেন।

পাখিদের মুখ থেকে এসব কথা শুনতে শুনতে জামসেদ ওয়াদিয়ার পুরোহিত ঢিলে ঢালা শাদা জামার বুকে ছবি হয়ে জেগে থাকা আমগাছ নতুন করে ডাল-পাতা নাড়তে থাকল। তার শাখায় শাখায় ফুটে থাকা আমের মুকুল আস্তে আস্তে নিজেদের সুঘ্রাণ মিশিয়ে দিতে থাকল হাওয়ায়। তারপর এক সময় সেই আম ডালেদের কেউ একজন খুব নিচু গলায় বলে উঠল, ঋষি জরথুশত্র তাঁহার রচিত গাথাগুলিতে প্রাচীন আর্য দেব-দেবীর কোনোরূপ উল্লেখ বিচার-পূর্বকই বর্জন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিবার পর চিত্রটির বদল হইল। জরথুশত্রিয় ধর্মের দায়িত্ব গ্রহণকারী মগ পুরোহিতগণ যখন দেখিলেন যে জনগণের কল্পনা সুপরিচিত দেব-দেবীর নানা নাম ধরিয়া থাকিতে চাহে, তখন তাঁহারা য়জত, বা দেবদূত নামে প্রাচীন দেবতাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। সংস্কৃতে য়জত ছিল যজত। দেবতাদের এই বিভিন্ন নাম কেবলমাত্র পুণ্যের প্রতীক হইয়াই রহিয়া গেল। তাহাদের সহিত কোনো মূর্তিপূজা বা বালিদানাদি সংশ্লিষ্ট রহিল না। সংস্কৃতে যিনি মিত্র ঐর্যানামে তিনিই মিথ্র। বেদের বৃত্রঘ্ন ঐর্যানামে বেরেথ্রঘন। ঐর্যানামের অর্তবহিষত বেদে হইলেন ঋত বশিষ্ঠ। ইহা ছাড়াও অহুরা মজদার আশ্রিত কতকগুলি দেবদূতের কল্পনা নূতন করিয়া করিলেন এই মগ পুরোহিতবৃন্দ। তাহাদের নাম হইল আর্দ্বি-সূর, অনাহিত প্রভৃতি। বলতে বলতে সনজানের সেই আম গাছের ডাল সামান্য দম নিল। তারপর আবার শুরু করল বলতে।—অর্দ্বি-সূর, অনাহিত প্রভৃতি তুলনামূলকভাবে নব্য দেবদূতগণের জন্য আরাধনামূলক যশৎ অর্থাৎ প্রার্থনা স্তোত্রাদি মগ পুরোহিতগণ সংগ্রহ করিলেন ও রচনা করিয়া দিলেন।

জরথুশত্র 'আতুর' মন্দির স্থাপিত হইল।

আম গাছের কাছে এই সব কথা শুনতে শুনতে কলকাতার মেটাকাফ স্ট্রিটের সেই পরিচিত অগ্নি-মন্দিরটি আবারও দেখতে পেলেন জামসেদ। তার বাইরের হলুদ দেয়ালে বিদায়ী সূর্যের বিষণ্ণ আলো। ভেতরে দোতলায় দেয়ালে জ্বলছে পূত পবিত্র অগ্নিশিখা—আলিমায়া। সেই আগুনের আলোয় কত কি মনে পড়ে যাচ্ছে জামসেদের

সংস্কৃতে অথর—অর্থবান শব্দের অর্থ অগ্নি বা আগুন। ঐর্যানামের আতর সংস্কৃতে অথর হয়ে গেছে। ওই অগ্নিমন্দিরের অগ্নিপ্রহরীদিগকে বলা হয় আর্থ্রবাজ বা অর্থবান। মগ পুরোহিতগণ মৃত মানুষের দেহকে অনাবৃত স্থানে স্থাপনের নিমিত্ত 'দখমা' বা সৎকার গৃহ স্থাপন করেন।

'দখমা'-র কথা শুনে ভেতরটা একটু যেন কেঁপে উঠল জামসেদ ওয়াদিয়ার। সেই একা, নিঃসঙ্গ দখমা, তার সিঁড়ি—বিশাল বড় ছাদ—মাথার ওপর তারা ছেটানো রাতের আকাশ বোধহয় হায় হায় করে উঠল জামসেদের এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে।

সনজানের এক কিলোমিটার দূর থেকে উঠে আসা সেই বুকে চলা আম গাছের ডাল কথা বলে উঠল। এই ভাবেই মজদায়সন দ্বারা ইরানিয় সমাজের ধর্মায়তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভিনব প্রাণ সঞ্চার হইল। মগ পুরোহিতগণ গ্রিস ও ইটালিতেও তাহাদের জ্ঞানের জন্য মাগোই বা মাগি নামে সম্মানিত হইতে থাকিলে। ঐর্যানামের সভ্যতার অন্যতম স্তম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন এই মগ পুরোহিতেরা। ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণদের মতোই তাঁহাদেব প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল।

গাছটি ডালপাতা নেড়ে নেড়ে এই সব কথা বলে যাচ্ছে। শুনতে শুনতে অনেক অনেক বছর আগে ঐর্যানামে জেগে ওঠা সভ্যতার নানান টুকরো টুকরো ছবি দেখতে পাচ্ছিলেন জামসেদ। মগ পুরোহিতরা অগ্নি-আরাধনার রীতি ও দর্শনিক ভাব নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন পৃথিবীর বহু জায়গায়। কিন্তু তার পরেই তো হানাদারি আর আক্রমণের রক্তমেঘ। মধ্য এশিয়া থেকে ঘোড়া দাবড়ে তলোয়ার উঁচিয়ে দৌড়ে আসছে মোঙ্গল আর তুর্কি হানাদারেরা। যাদের নাম তুরানিও বলা হয়েছে কোথাও কোথাও। এই তুরানি ঘাতকের হাতেই নিহত হলেন ঋষি জরথুশত্র। তখন তিনি অগ্নিমন্দিরে ব্যস্ত ছিলেন অগ্নি উপাসনায়। ব্যবিলন ও আসিরিয়ার কোমিয় জাতির মানুষেরাও আক্রমণ করে বসল ঐর্যানাম বা ইরান। ঘোড়ার খুরের শব্দ, অসির ঝনঝন, ধনুকের টংকার—সব মিলিয়ে মানুষে মানুষে তুমুল যুদ্ধ। রক্তপাত। আর্তনাদ আর চোখের জল। রক্তের কটু, ঝাঁঝাল গন্ধ। শবের পাহাড়।

যুদ্ধ মানেই তো তাই। ফিসফিস করে বলে উঠল সনজানের আম্রবৃক্ষটি। তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ইতিহাসের নানান দাগ। সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে জামসেদ দেখতে পেলেন ঘোড়ার খুরে খুরে উড়ে যাচ্ছে ধুলোর মেঘ, খোলা তলোয়ার হাতে আক্রমণকারী ঘোড়সওয়াররা নানান চিৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রাচীন ইরানের ওপর। অশ্বারোহীদের উন্মত্ত হা-হা-হা রণধ্বনি, খোলা তলোয়ারের গা থেকে চমকে ওঠা আলো—সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

পালতোলা নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে আকাশ, জল অন্ধকারের ভেতর জেগে থাকা তারার আলো দেখতে দেখতে জামসেদ বুঝতে পারলেন কেমন করে আক্রমণে আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে অগ্নি-মন্দির। ঐর্যানামের প্রাচীন সংস্কৃতি। সভ্যতা।

শুধু তুরানি বা কোমিয়রাই নয়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট—তাহাকে তো কেহ কেহ আলেকসান্দর বলিয়াও জানে কিংবা সেকেন্দার শা—সেই আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য জয় কালে ইরানি ধর্মগ্রন্থের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংস করে। ইহার ভিতর পার্সি পোলিসের 'তখত-ই-জামসিদ' ও ছিল। তখত-ই-জামসিদ-এ অগ্নিসংযোগ করা হয়। জ্ঞানের পুঁথি-পুস্তক, বই ও কেতাব লইয়া বহ্নুৎসব। লক্ষ লক্ষ পুঁথি-পুস্তক, অনলে ভস্মীভূত হইতেছে, সেই অনলের হোতা বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখা আলেকজান্ডার ও তাহার সুসজ্জিত গ্রিক বাহিনী।

পুস্তক পুড়িতেছে। মেধা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা জ্বলিতেছে। আকাশের তারারা নীচু গলায় শোনাচ্ছে এইসব কাহিনী। জামসেদ ওয়াদিয়া সেই সাগরজল কেটে এগিয়ে চলা কাঠের তৈরি বড় নৌকোটির ওপর দাঁড়িয়ে, আকাশের তারামণ্ডলী দেখে পথের হদিশ করতে করতে মানুষের চামড়া, মাংস, হাড় পোড়া গন্ধ পেলেন। বই পুড়লে কি এমন শ্মশান-গন্ধ উঠে আসে?

হাজার হাজার বছরের সভ্যতার সারসংক্ষেপ এই সব পুঁথি-পুস্তক জ্বলে গেলে আর কি-ইবা থাকে? বইদের জ্বলে যাওয়ার ছবি ধোঁয়ায় ধুলোয় পোড়া গন্ধে কেমন যেন আবছা হয়ে আসে ক্রমশ। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখা ফিলিপের ছেলে, ম্যাসেডোনিয়ার রাজকুমার সেকেন্দার শা—আলেকজান্ডার আর তার গ্রিক বাহিনী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিল তখত-ই-জামসিদ—পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার। পারস্য থেকে আর গ্রিসে ফিরতে পারেননি আলেকজান্ডার। পথেই মারা যান।

সেই সব কথা, স্বপ্ন এই মহাকালের গতিতে ছুটে যাওয়া নৌকোর ওপর, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায়। সময়ের ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগোয় নৌকো। জামসেদ ওয়াদিয়ার মাথার ওপর তারা বোনা অনন্ত নীল আকাশ। সেই আকাশে যত না নীল, তার তুলনায় কালো অনেকটা বেশি। ব্লু-ব্ল্যাক কালি যেমন হত—অনেকটা যেন তেমনই রঙ আকাশের। এই অকূলে ভাসা—অনেক অনেক দূর চলে যাওয়া সমুদ্র ভেঙে, ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জামসেদ।

রাতের এই অন্ধকারে নোনা বাতাস এসে লাগে ছড়ানো পালে। হাওয়ায় হাওয়ায় ফুলে ওঠে পাল। আঁধারে একদম অন্যরকম লাগে এই পালকে। নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে সমুদ্র পেরিয়ে যেতে যেতে জামসেদ ওয়াদিয়া শুনতে পান আকাশ থেকে নেমে আসা সেই আদিবাণী—

ইন্দো-ইরানীয় আর্যগণ নানা প্রাকৃতিক শক্তি—যথা সূর্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। তাহারা মনে করিত ওই সকল দেবতা উর্দ্ধে অবস্থিত স্বর্গ হইতে মানুষের কার্যকলাপ ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। পরে ক্রমশ এই ধর্মাচরণের মধ্যে কুসংস্কার, পূজা, যজ্ঞে, পশু বলিদান এবং নানা প্রকার উৎপীড়ন প্রবেশ করে। করপন এবং উসিজ নামে পুরোহিতরা এই সব ক্রিয়া কাণ্ড হইতে লাভবান হইতে থাকে এবং 'কবি' নামে পরিচিত শাসক প্রভুগণকে হানা দিয়ে গোহরণ,

যজ্ঞে পশুবধ এবং প্রজার ধন-সম্পদ লুণ্ঠন ও তাহাদের প্রতি নানা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত করে।

ইহাদের মধ্যে গোধনের রক্ষক ও সমাজের সংস্কারক রূপে ঋষি জরথুশত্র আবির্ভাব হয়। তিনি শাসক বর্গের নেতা ও শিক্ষাগুরুও ছিলেন। জরথুশত্র ঘোষণা করেন, অহুর মজদা অর্থাৎ শক্তিময় ও জ্ঞানময় ঈশ্বর হইলেন একমাত্র সৃষ্টি কর্তা। প্রকৃতির অন্তর্গত তাবত বস্তু ও শক্তি তাহার সৃষ্টির নিয়মের বা ধর্মের অধীন। যে নিয়ম বা ধর্ম আদি আর্য ভাষায় 'ঋত' নামে অভিহিত হইত। এই নাম সংস্কৃতে 'ঋত' রূপেই বিদ্যমান। ইরানে প্রাচীন পারসিক ভাষায় ইহার রূপ হইতেছে 'অর্ত' এবং অবেস্তার ভাষায় 'অব'।

ঈশ্বর মানুষের মনে চিন্তাশক্তি দান করিয়াছেন। মানুষকে 'স্পেন্ত মইন্যু' (শুদ্ধ শক্তি) এবং 'অঙ্গ্র মইন্যু' (অসৎ শক্তি)—এই দুই শক্তির ভিতর একটিতে বাছিয়া লইয়া চলিতে হয়। সৎ পথে চালিত মানুষের পক্ষে ছয়টি 'অমেষ স্পেন্ত'—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আদর্শ অবলম্বন করা আবশ্যক।

আকাশ থেকে ভেসে আসা ঐশী বাণী শুনতে শুনতে জামসেদ ওয়াদিয়ার মনে পড়ল এসব কথা আগেও তো শোনা হয়েছে। তিনি খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে ছটি আধ্যাত্মিক আদর্শের কথা বলা হলো, তা কী কী?

উত্তর পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। জামসেদ শুনতে পেলেন, ছয়টি আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতেছে বোহুমনো, অষ, খষত্র, আরমইতি, হুর্বতাৎ, অমরেতাৎ।

এগুলোর সংস্কৃত মানে এরকম। বোহুমনো অর্থে বসুমনস বা শ্রেষ্ঠ মনন। অষ বা ঋত অর্থে সত্য ও সততা। খষত্র অর্থে ক্ষত্র অর্থাৎ দৈবশক্তি। আরমইতি শব্দটি সংস্কৃতে ভক্তি বা ঈশ্বর অনুরাগ। হুর্বতাৎ সংস্কৃতে সর্বতাৎ। অর্থ পরিপূর্ণতা। অমেরেতাৎ সংস্কৃতে অমৃতাৎ বা অমৃতত্ব।

আকাশের গা থেকে ভেসে আসা বহু বছর ধরে জানা কথারা একটু একটু করে বসে যাচ্ছে জামসেদ ওয়াদিয়ার মনের ভেতর।

জীবন শেষে মানুষের উর্বন বা আত্মা সুবিচার লাভ করিয়া 'পাইরিদ এজ্র' বা স্বর্গলোক লাভের পুরস্কার পায় কিংবা ভোগ করে নরকের শাস্তি। প্রত্যেক যুগ বা কালচক্রের আবর্তন শেষে ফ্রষোকেরেতি বা আত্মার পুনর্জীবন লাভ হয়।

চার পাশেই রাতের কালো। সমুদ্রে গর্জন ছাড়া আশপাশে তেমন করে কোনো শব্দ নেই। আকাশের তারারা জেগে আছে চুপচাপ।

অকূলে ভাসতে ভাসতে জামসেদ ওয়াদিয়ার চোখে কিসের যেন ছায়া পড়ল। গভীর ছায়া। সেই ছায়ায়-আলোয় বোনা একটা ছবি হঠাৎ যেন বা উড়তে উড়তে এসে থমকে স্থির হয়ে গেলে জামসেদের সামনে। সে কী প্রাচীন ঐর্যানামের কোনো নৈশব্দের ভূমি? কি অদ্ভুত সব সবুজ, কালচে সবুজ চারপাশে। গাছের সবুজ সবুজ জাল, পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে রোদ এসে পড়ছে।

সামনে অনেকখানি ফাঁকা। সেখানে ঘাসেরা জেগে আছে। জামসেদ ওয়াদিয়া নিজেকে সেই ঘাসের ওপর দাঁড়ান দেখতে পেলেন। সামনে—ঐ তো সামনেই, উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ির ধাপ। বেশ চ্যাটালো পাথরে তৈরি সিঁড়ি। কালচে মতো পাথর।

সিঁড়িরা সবাই এক সঙ্গে হাতছানি দিয়ে 'আয় আয় আয়' বলে ডাক দিল জামসেদকে। সিঁড়ির প্রথম ধাপ—যা কি না ঘাস মোড়া উঠোনের একেবারে গায়ে গায়ে, অনেকটাই ডুবে আছে সবুজ সবুজ ঘাসে। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে এলে একটা ছোট চাতাল। তারপরই মাথায় পাথরের খিলান দেয়া সেই হাঁ-মুখটি।

একে তো দরজাও বলা যেতে পারে। নৈশব্দভূমিতে ঢোকার পথটি একে বারে চুপ করে আছে। পাথরে তৈরি চার দিক ঘেরা দেয়াল বেশ উঁচু, তার পাথুরে রঙে পুরোটাই কালো—দেখতে দেখতে দেখতে জামসেদ ওয়াদিয়া দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'দাখমা'—দাখমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। কেউ চলে গেলে, তার শেষ শ্বাস বায়ুটি বেরিয়ে এলে পুরনো কাপড়ে তার সারা শরীর ঢেকে দিয়ে 'দাখমা'-র দিকে খুব ধীরে ধীরে আসা। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভেতরে এসে তার গা থেকে সেই কাপড় সরিয়ে নেয়া।

আকাশে ততক্ষণ উড়তে শুরু করেছে শকুনরা। একটা দুটো তিনটে। কাকেরাও তৈরি হয়ে আছে মহাভোজের জন্যে। তাদের কালো কালো পাখা একটু একটু করে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। স্পষ্ট হচ্ছে সেই সব মাংসভোজী পাখিদের ধারাল ঠোঁট!

জামসেদ ওয়াদিয়া সব দেখতে পাচ্ছেন। পাথর দিয়ে তৈরি দেয়াল তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ফাঁকা —ছাদ ছাড়া ঘেরা জায়গাটির ওপর দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে শকুন।

ঠিক মতো ঠুকরে খেলে একটি মৃতদেহর গা থেকে মাংস পরিষ্কার করতে লাগে তিরিশ মিনিট। ছাদ বিহীন জায়গাটিতে পড়ে থাকে হাড়েরা। শকুনদের ভেতর থেকে কে একজন ফিস ফিস করে বলল। বাড়ি ফিরে আসার তিন দিন পর আবার দাখমায় ফিরে গিয়ে সেই সব অস্থি কুড়িয়ে, গুছিয়ে তুলি নিয়ে আবার তাদের ফেলে দেয়া একটি গর্তে। গর্তের ভেতর শাদা শাদা হাড়েরা চুপ করে থাকে।

এসব দেখতে দেখতেই জামসেদ ওয়াদিয়া আবারও সমুদ্রের গান শুনতে পেলেন। সমুদ্র তাঁকে অনেক দূরে ভেসে যাওয়ার গান শোনাচ্ছে।

ঠিক তখনই ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালের কেবিনে নিজের বেডে শুয়ে নানাভাই মোদির অসম্ভব ভয় করতে লাগল। সেই ছাদ ছাড়া বিশাল বাড়িটি যেন না ডানা মেলে উড়ে নামল কেবিনের ভেতর।

নানাভাইয়ের মনে পড়ল অহুর মজদা হলেন জীবন, আলো, জ্ঞান ও সত্যের

দেবতা। অহুর মজদার শরীর আলোয় তৈরি। আর তাঁর আত্মা হচ্ছে সত্য। সূর্য, চাঁদ, তারারা আলো দেয় পৃথিবীকে। আর এদের যে আলো, তাঁর উৎস হলেন অহুর মজদা। অহুর মজদা থেকে মানুষকে আলাদা করতে পারে না পাহাড়, না পারে সমুদ্র। খালি মানুষকে অহুর মজদা থেকে আলাদা করতে পারে কু-চিন্তা।

উঃ! বড্ড কষ্ট হচ্ছে।—সিসটার সিসটার। গলা ছেড়ে ডাকল নানাভাই। কিন্তু তার ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ বেরিয়ে এল না।

গলার ভেতরটা শুকিয়ে সাহারা।

একটু জল। একটু জল। জিভ টেনে ধরছে ভেতরে।

নানাভাই তার কেবিনের ভেতর আবারও সেই ছাদ খোলা বিশাল বাড়িটি দেখতে পেল।

নীল আকাশের গায়ে চাঁদ ভেসে আছে। সেই চাঁদের আলো নিজের মতো এসে পড়েছে সেই ছাদ খোলা বাড়িতে ওঠার পাথরের দশটি সিঁড়িতে। এক দুই তিন চার করে করে দশ দশটা সিঁড়ি।

উঠে এলে একটা ঢোকার জায়গা। সেই ঢুকে পড়ার জায়গাটির মাথাতেও খিলান। দূর থেকে এই ভেতরে আসার পথটিকে দেখলে ছম ছম করে ওঠে সমস্ত গা। কেমন একটা কালো অন্ধকার আটকে আছে ঐ জায়গাটিতে।

দুপাশে ঝাউ গাছ। সবুজ সবুজ ঝোপ। ঘাস। পেছনে চাঁদ মাখা নীল আকাশ। সেই আকাশ-আলো এসে পড়ছে দখমার পাথরের মেঝেয়। গোটা জায়গাটাই—পাথরের দেয়াল টেয়াল, ঢুকে আসার জায়গাটি নিয়ে কেমন যেন ডিমেল চেহারার। যাকে কি না ওভাল শেপও বলা যায়। বার বার দখমার ভেতরে যাওয়ার সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছে নানাভাই। সিঁড়ির দশটা ধাপেই জড়িয়ে আছে চাঁদের আলো।

কোথাও কোনো শব্দ নেই।

নানাভাই গলা ছেড়ে ডেকে উঠল—রোজি! নওরোজি!

তার গলা দিয়ে খানিকটা গোঙানি বেরিয়ে এল শুধু।

দখমার দশটা সিঁড়ি, ওভাল শেপের চাঁদ মাখা দেয়াল, অন্ধকার দরজা---সব কেমন যেন দশ হাতে 'আয় আয় আয়' বলে ডাক দিচ্ছে নানাভাই মোদিকে।

এই রকম চাঁদে পাওয়া সময়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে ওঠে চরাচর। সনজানের ভিলবাদি গ্রামের বুকে হাঁটা সেই আম গাছটি নিজের স্বভাব মতো শেকড় ছড়াতে ছড়াতে এসে পৌঁছে গেল দখমার কাছাকাছি। তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় তখন থই থই চাঁদ হাততালি দিচ্ছে। সেই শব্দহীন করতালির ভেতর আমগাছটি নিজের নতুন ডাল নতুন শেকড় চারিয়ে দেয়ার জন্যে জমি খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্যোৎস্নায় মাখামাখি দখমার দরজা, দেয়াল, চবুতরা, সিঁড়িরা খুব স্পষ্ট করে নানাভাই মোদির নাম ধরে ডাক দিল—একবার। দুবার তিনবার।

গায়ে কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠল নানাভাইয়ের। এখন তো কারও তাকে ডাকার সময় নয়। তাহলে? তবে কি কেমো থেরাপি দেয়ার সময় হলো! কিংবা রে দেয়ার? ট্রলি নিয়ে এসে গেছে কি রেডিয়েশান দেয়ার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ওয়ার্ড বয়? এবার যেতে হবে—সিসটারের অনুমতি নিয়ে। সঙ্গে অবশ্য সিসটার থাকবে। যতক্ষণ না রে দেয়া কমপ্লিট হয়, বসে থাকবে সেখানে। ঘরের বাইরে—বেঞ্চের ওপর।

কিন্তু এখন কি রে দেয়ার সময়? সময়ের হিসেব সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে নানাভাই মোদির। রে দেয়া তো হয় সকালে—দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ। ফিরে আসতে আসতে সাড়ে বারোটা, একটা। কিন্তু এখন কি সকাল, দুপুর না রাত্তির? কখন—কোন সময়ে আছি আমি? এই ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে কেবিনের ভেতর নেমে এসেছে দখমা। যার সিঁড়ি, পাথুরে দেয়াল, খোলা ছাদ, মেঝে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। টের পাচ্ছি তাদের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্পর্শ। তারা আমায় ডাকছে। দশ হাত ছড়িয়ে ডাকছে। এসব ভাবতে ভাবতেই মাথা ঘুরে উঠল নানাভাই মোদির। পেটের ভেতর থেকে অনেকটা রক্তবমি গুলিয়ে পাক খেয়ে উঠে আসতে চাইল গলার কাছে।

গাল টোপলা হয়ে উঠছে বমির ভারে। মুখের ভেতর অনেক রক্ত, রক্তের ডেলা, থুথু। নানাভাই মোদি আর পারছে না। দখমার সিঁড়ি অন্ধকার প্রবেশ পথ, দেয়াল তাকে বারে বারে হাতছানি দিচ্ছে।

বমির চাপে বিছানা থেকে মাথা তুলে বাইরে আর মুখ বাড়াতে পারল না নানাভাই। মুখের ভেতর থেকে জবরদস্তি ঠেলে উঠে আসা ভারবোঝা ওয়াক ওয়াক করে নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো বালিশ, বিছানার চাদরে।

ঠিক ঐ সময় ওয়াদিয়া ম্যানসনের দোতলায় দেয়ালে টাঙান পুরনো অ্যান্টিক দেয়ালঘড়িরা পর পর নিজেদের মতো এলোপাথাড়ি বেজে যেতে থাকল— ঢং ঢং ঢং। ঢং ঢং। ঢং।

অনেক অনেক বছরে আগের সাগর জল ও প্রাচীন জ্যোৎস্না একই সঙ্গে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে থাকল ওয়াদিয়া ম্যানসনকে।